নিখিলনাথ রায়-প্রণীত

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী

প্রথম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ
পুনর্মুদ্রণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

সূচীপত্র

ভূমিকা

'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'-প্রণেতা নিখিলনাথ রায় বাঙ্গলার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। জেলা ২৪-পরগনার অন্তর্গত পুঁড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩৩৯ সালের ১৮ই কার্ত্তিক প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন এবং স্বদেশের ইতিহাস-পাঠেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাজপুত-বীরগণের কীর্ত্তি-কথা-অবলম্বনে ছাত্রজীবনেই তিনি একখানি কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন; সেই ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকের নাম 'রাজপুত-কুসুম'। ১২৯১ সালে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর 'অশ্রুহার' নামে আরও একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার মন পদ্য-রচনা ছাড়িয়া প্রবন্ধ-রচনার দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী,' 'অনুসন্ধান,' 'সাহিত্য,' 'নব্যভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩০৪ সালে তাঁহার রচিত 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক লিখিয়াই তিনি পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হন। নিখিলনাথের বয়স সে-সময়ে বত্রিশের বেশী হইবে না।

'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী; অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতই মুর্শিদাবাদের সম্বন্ধ। এইখান হইতেই বাঙ্গলার মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য মুর্শিদাবাদের ইতিহাসালোচনা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, আমি মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই।....ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যে সকল প্রবন্ধ সংবাদ ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাদের সহিত আরও কতকগুলি যোগ

করিয়া 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।....সাধারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি চিত্র ইহাতে দেখিতে পাইবেন।"

বাস্তবিকই 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' প্রকাশিত হইবার পর, উহা পাঠ করিয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাসের বহু বিচিত্র কাহিনী সন্নিবেশিত আছে। এই কাহিনীগুলি শুধু প্রীতিপ্রদ নহে—শিক্ষাপ্রদও বটে। সেইজন্য বাঙ্গলার অতীত যুগের এই চিত্রগুলি বাঙ্গলার ছাত্রদিগের সম্মুখে ধরিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদের পাঠোপযোগী করিয়া 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী

আলীবর্দ্দী-বেগম

রাজনীতির সেবা সাধারণতঃ কঠোর-প্রকৃতি পুরুষই করিয়া থাকেন। কোমল-প্রাণা নারী প্রায়ই এই জটিল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহেন না। কিন্তু অনেক সম্রাট্ ও রাজনীতিবিদের জীবনে তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণের প্রতিভার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর ন্যায় রাজনীতিবিদ্ পুরুষ বাঙ্গলার সিংহাসনে অল্পই উপবেশন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসল্‌মানের প্রতি সম-প্রীতি দেখাইয়া মহাবিপ্লবের মধ্যেও শান্তভাবে প্রজা-পালন করিতে মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হন নাই। এই কর্ম্মবীর আলীবর্দ্দী খাঁর রাজনীতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী শর্‌ফুন্নেসার সহায়তায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। আলীবর্দ্দীর বৃহৎ সংসার যেরূপ সেই মহীয়সী মহিলার তর্জনী-তাড়নের অধীন ছিল, সেইরূপ বিপ্লব-সাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গরাজ্যের শাসন-যন্ত্রও তাঁহারই পরামর্শ-অনুসারে চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য্য, পরহিতেচ্ছা ও অন্যান্য সদ্‌গুণে তিনি নারী-জাতির মধ্যে অতুলনীয় ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত।

একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, নিষ্ঠুর কার্য্য ব্যতীত রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রধান ও গুরুতর ব্যাপারে নবাব তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। নিষ্ঠুর কার্য্যে বেগমের অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তিনি বলিতেন যে,

ঘৃণ্য ও নৃশংস পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহার বংশ নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। তাঁহার জ্ঞান ও দূরদর্শিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নবাব সর্ব্বদা বলিতেন যে, বেগমের সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যদ্‌বাণী কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আলীবর্দ্দী-বেগম কেবল মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদস্থিত পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া সুরম্য ভাগীরথী-শোভা-সন্দর্শনে জীবন-যাপন করিতেন না, তিনি নবাবের সহিত ভয়াবহ যুদ্ধবিগ্রহে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মনে উৎসাহ-সঞ্চার করিতেন। নবাবের সহিত রণক্ষেত্রে গমন করিয়া তিনি অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন নাই।

যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বাঙ্গলারাজ্য মন্থন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিল, সেই সময়ে নবাব তাহাদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যা হইতে বর্দ্ধমানাভিমুখে অভিযান করেন। সে যুদ্ধে নবাবের সহিত শর্‌ফন্নেসা বেগমও উপস্থিত ছিলেন। বেগম একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর সমর-সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই হস্তীর চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া বেগমকে বন্দী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু নবাবের জনৈক সেনাপতি অসীম বীর্য্যবত্তা দেখাইয়া সেই কৃতান্তদূতদিগের হস্ত হইতে বেগমকে রক্ষা করেন। এইরূপ আরও অনেক স্থলে তিনি বিপদ্‌ বরণ করিয়া রণক্ষেত্রের অসীম কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। যদিও তৎকালে বাদশাহ্‌ ও নবাবগণ আপন আপন বেগমদিগকে লইয়া অনেক সময়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন, তথাপি অবরোধবাসিনী মহিলার এরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে রণস্থলে বিচরণের উদাহরণ ইতিহাসে অতি অল্পই পাওয়া যায়। রাণা রাজসিংহের সৈন্যদিগের হস্তে বন্দী হইয়া বাদশাহ্‌ ঔরঙ্গজেবের বেগমেরা আতঙ্কে প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বহুবার কষ্ট ভোগ করিয়াও আলীবর্দ্দী-বেগমের হৃদয় কখন বিচলিত হয় নাই।

রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যাপারের সহিত বেগমের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেই প্রসঙ্গে দুই একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

নবাব আলীবর্দ্দী খঁার সময়ে বঙ্গরাজ্য বারংবার মহারাষ্ট্রীয়গণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তিনি তাহাদিগের অত্যাচারে জর্জরিত এবং অনন্যোপায় হইয়া, বিশ্বাস-ঘাতকতা-পূর্ব্বক রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে মনকরার ময়দানে নিহত করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যা-সংবাদ-শ্রবণে রঘুজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং সসৈন্যে প্রথমে উড়িষ্যায় আগমন করেন এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা দুর্লভরামকে বন্দী করিয়া বীরভূম-প্রদেশ দলিত করিতে করিতে বিহারে উপস্থিত হন। তথায় আলীবর্দ্দীর বিদ্রোহী আফগান-সৈন্যদিগের সহিত তাঁহার মিলন সংঘটিত হয়। বিহারে নবাবের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। ক্রমাগত যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ নবাবের অনেক আফগান-সৈন্য উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ না করিয়া বিদ্রোহী আফগান-দিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করে। নবাব আফগানদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। সম্মুখে শত্রুগণ ভীষণ হুঙ্কার ছাড়িতেছে, আর এদিকে নিজ সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত—এরূপ অবস্থায় নবাবের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

এক দিন বেগম নবাবকে বিষণ্ণ চিত্ত দেখিয়া, তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নবাব বলিলেন, "আমি আমার সৈন্যসামন্তদিগের মধ্যে অন্যরূপ ভাব দেখিতেছি; কেন যে এ সকল ব্যাপার ঘটিতেছে বলিতে পারি না।" সকল কথা শুনিয়া, বেগম নিজেই দুইজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে রঘুজীর নিকট দূত-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পথপ্রদর্শক ও নবাবের প্রবল শত্রু মীর হবীবের নিকট উপস্থিত হইলে, মীর হবীব তাঁহাদিগকে রঘুজীর নিকটে লইয়া যান। রঘুজী পুনঃপুনঃ যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া মনে মনে সন্ধি-স্থাপনে উৎসুক হইলেও, মীর হবীব তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে বারংবার উত্তেজিত করেন। মীর হবীবের উত্তেজনায় রঘুজী সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, নবাবও বেগমের পরামর্শ-অনুসারে পুনর্ব্বার নিজ সৈন্যগণকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন

করিতে এবং তাহাদিগকে আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে আজ্ঞা দেন। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নবাব সঙ্কট-মুক্ত হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণ যেরূপ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিল, সেইরূপ কতিপয় আফগান-সেনানীও কিছুদিন তাঁহার অশান্তির কারণ হইয়াছিল। মোস্তাফা খাঁ, শম্‌শের খাঁ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া বিহার-প্রদেশে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটাইয়াছিল। মোস্তাফা খাঁ হত হইলে আফগানেরা কথঞ্চিৎ ভগ্নোদ্যম হয়, কিন্তু তাহারা কৌশল-পূর্ব্বক নবাবের রাজ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে। আলীবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দীন (সিরাজুদ্দৌলার পিতা) তৎকালে বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আফগানেরা কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করায়, জৈনুদ্দীন তাহাদিগকে নিজ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। আফগানেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে স্বীকৃত হয়। পরে তাহারা দরবার-গৃহে জৈনুদ্দীনের সহিত সাক্ষাতের ছলে তাঁহাকে সেই স্থানে নিহত করিয়া, তাঁহার পরিবারবর্গের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করে। তাহারা জৈনুদ্দীনের পত্নী আমিনা বেগম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে উন্মুক্ত গো-শকটে আরোহণ করাইয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করায়, এবং জৈনুদ্দীনের পিতা (আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা) হাজী আহ্‌মদকে অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া নিহত করে। ক্রমে সমস্ত বিহার-প্রদেশ তাহাদের করতলগত হয়।

প্রাণাধিক প্রিয় জামাতা জৈনুদ্দীনের ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার এতাদৃশ শোচনীয় পরিণামের সংবাদ-শ্রবণে নবাব অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। স্নেহপুত্তলী কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের নির্য্যাতন ও অবমাননায় নবাব অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহার উপর পাটনা ও সমস্ত বিহারের দুর্দ্দশার স্মৃতি তাঁহাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে তাঁহাকে নিতান্ত নিস্তেজভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, নবাব-মহিষী তাঁহাকে আফগানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের প্রাণ-প্রিয় আত্মীয়গণের উদ্ধার-সাধন হয়, তজ্জন্য তিনি প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি নবাবের হৃদয়দৌর্ব্বল্যের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া, যাহাতে তাঁহার

মনে শত্রু-দমনের ইচ্ছা বলবতী হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে অবিরত প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বেগমের উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া নবাব আফগানদিগের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার যুদ্ধ-কৌশলে আফগানগণ অচিরাৎ পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। নবাব আপনার কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের উদ্ধার-সাধন করিয়া এবং আফগানদিগের পরিবারবর্গের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া, যুগপৎ শৌর্য্য ও মহত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। বেগম যদি আলীবর্দ্দী খাঁকে আফগানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ নবাব শোকে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িতেন যে, শত্রু-দমন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত।

বেগম এইরূপে অনেক স্থলে নবাবের হৃদয়দৌর্ব্বল্যের অপনোদন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ-সহকারে কার্য্যে ব্রতী করিতেন। কি মহারাষ্ট্রীয়-সমরে, কি আফগান-বিদ্রোহে—সর্ব্বত্রই উপস্থিত থাকিয়া তিনি নবাবকে নানারূপ পরামর্শ দিতেন এবং সময়ে সময়ে স্বয়ং অনেক কার্য্যের ভার লইয়া নবাবের কষ্টের ভার লঘু করিতে যত্নবতী হইতেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপে বেগমের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভার জন্য আলীবর্দ্দী খাঁ, রাজধানী হইতে আপনার অনুপস্থিতি-কালে, অনেক সময়ে তাঁহার হস্তে রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিতেন ; তজ্জন্য তিনি দিল্লীর বাদশাহ্-দরবার হইতে বিশেষ আদেশ আনাইয়া লইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের ‘ গদ্দীনশীন বেগম ’ পদের সৃষ্টি হয়।

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজনীতিক জীবন যেরূপ অনেক পরিমাণে তাঁহার বেগমের সহায়তার উপর নির্ভর করিত, সেইরূপ তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলার জীবনও বাল্যকাল হইতে সেই আদর্শ মহিলার হস্তে গঠিত হইয়াছিল। সিরাজ শৈশব হইতে তাঁহাদের নিকটে অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান সমরে উপস্থিত থাকিয়া অনেক পরিমাণে সুশিক্ষিত ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এরূপ চঞ্চল ও বিলাসপরায়ণ ছিল যে, আলীবর্দ্দী খাঁ ও বেগমের সহস্র সুশিক্ষা সত্বেও তাহা কুপথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তথাপি সিরাজের জীবনে

আলীবর্দ্দী ও তাঁহার বেগমের শিক্ষার অনেক সুফল দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহাদের শিক্ষাগুণে অনেকস্থলে সিরাজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয় যে, ইতিহাসে তাঁহাকে যেরূপ শয়তানের অবতার বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সেরূপ কলুষ-প্রকৃতি ছিলেন না।

সিরাজ কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া অবশেষে মীরনের আদেশে নিহত হন, এবং মীরজাফর বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদে উপবেশন করেন। এই সময় হইতে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর পরিবারবর্গের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয়। যে বেগমের পরামর্শে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ সুকঠিন রাজনীতিক কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিতেন, যাঁহার সহায়তায় তিনি বিঘ্নরাশির মধ্যেও প্রজাগণের শান্তি-বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেশীয় ও বিদেশীয়গণ মুক্তকণ্ঠে যে অতুলনীয় রমণীরত্নের প্রশংসা করিতেন, তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মীরজাফরের পুত্র 'ছোট নবাব' মীরন তাঁহার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে দুঃখে ও ঘৃণায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আলীবর্দ্দীর বেগম, তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘসেটী ও আমিনা এবং সিরাজুদ্দৌলার পত্নী ও শিশু-কন্যাকে অযথা কষ্ট প্রদান করিয়া বন্দী-ভাবে রাখা হয়। বন্দী-অবস্থায় অশেষ যন্ত্রণা দিবার পর তাঁহাদিগকে মর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় নির্ব্বাসিত করা হয়। ঢাকায় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বাস করিতে হইয়াছিল। মীরন তাহাদিগের জীবিত থাকা বিপজ্জনক মনে করিয়া, ঢাকার নায়েব জেসারৎ খাঁকে তাঁহাদের বিনাশের জন্য বারংবার লিখিয়া পাঠান; কিন্তু জেসারৎ খাঁ এই নৃশংস প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়ায়, মীরন নিজের একজন প্রিয়পাত্রকে উক্ত কার্য্যের জন্য পরওয়ানার সহিত ঢাকায় প্রেরণ করেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বেগম কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং সিরাজের বেগম ও কন্যাও অব্যাহতি পান। কিন্তু ঘসেটী বেগম ও আমিনা বেগমকে নৌকাযোগে ঢাকা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার ছলে, ঢাকা হইতে কিয়দ্দূরে পদ্মা-গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া হত্যা করা হয়; তাঁহারা মৃত্যুকালে মীরনকে অভিসম্পাত করিয়া যান, যেন বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মীরনের নাকি বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহার পর শরফুন্নেসা বেগমের বিষয়ে বিশেষ-কিছু অবগত হওয়া যায় না। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাকে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া আনা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর খোশ্‌বাগে আলীবর্দ্দী খাঁর সমাধির নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

লুৎফুন্নেসা

বেগম লুৎফুন্নেসা নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রিয়তমা মহিষী। লুৎফুন্নেসা মানবী হইয়াও দেবী ; তাঁহার পবিত্র সাহচর্য্যে হতভাগ্য সিরাজ আপনার তাপদগ্ধ জীবনে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। লুৎফুন্নেসা ছায়ার ন্যায় সিরাজের অনুবর্ত্তন করিতেন ; কি সম্পদে, কি বিপদে, তিনি কখনও সিরাজকে পরিত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার যুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সিরাজ যখন আমোদ-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেন, তখনও লুৎফুন্নেসা তাঁহার সহচরী ; আবার যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তেজোহীন—আভাহীন—কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন, তখনও লুৎফুন্নেসা তাঁহার অনুবর্ত্তিনী। যখন ষড়যন্ত্রকারিগণের ভীষণ চক্রে সিরাজ পলাশীর রণক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়া সাধের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহার আকুল আহ্বানে ও মর্ম্মভেদী অনুনয়েও কেহ তাঁহার অনুগমন করে নাই ; কেবল পতিপ্রাণা লুৎফুন্নেসা আপনার জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া শত বিপদ মাথায় লইয়াও সিরাজের অনুসরণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

লুৎফুন্নেসা কোন উচচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি বাল্যকালে ক্রীতদাসী-রূপে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর হারেমে প্রবেশ করেন। তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি ও সুকোমল স্বভাব সিরাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। লুৎফুন্নেসার অপরিসীম স্নেহ ও সহৃদয়তা সিরাজের মনকে বহু অনাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। কি সম্পদে, কি বিপদে, কোন সময়েই লুৎফুন্নেসার সান্নিধ্য ব্যতিরেকে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না।

বহু ক্ষেত্রে এই অলোকসামান্যা মহিলার সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর ইংরেজদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সিরাজ কাসিমবাজারের কুঠী অধিকার করিয়া, তাহার অধ্যক্ষ ওয়াট্‌সকে সপরিবারে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন। সিরাজ-জননী ওয়াট্‌স-এর পত্নীকে ও পুত্রকন্যাদিগকে নিজ মহলে ৩৭ দিবস পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করেন; তাহার পর লুৎফুন্নেসার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে জলপথে চন্দননগরের ফরাসী শাসনকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, সিরাজ এ-কথা জানিতে পারিলে তাঁহাদিগের লাঞ্ছনার একশেষ হইত। কিন্তু সেই ইংরেজ-পরিবারের দুঃখ তাঁহাদের হৃদয়কে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাঁহারা সিরাজের ক্রোধ-সম্ভাবনা-ভয়েও ভীত হন নাই। কেবল তাহাই নহে, লুৎফুন্নেসা সিরাজের নিকট ওয়াট্‌স-এরও মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সিরাজকে সানুনয়ে বলিয়াছিলেন, "কুঠীয়াল-সাহেব আপনারই প্রজা ও আপনারই সন্তান। আপনি সন্তানকে ব্যথা প্রদান করিতেছেন কেন? সামান্য একজন ইংরেজ প্রজাকে বন্দী করিয়া রাখা বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বরের কদাচ উচিত নহে।" ইহাতে নবাব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ওয়াট্‌সকে বন্দী করিলে কলিকাতার ইংরেজ বণিকেরা সংযতভাবে কার্য্য করিবে। কিন্তু সেই উদার-হৃদয়া মহিলার কাতর আবেদনে সিরাজ অবশেষে ওয়াট্‌সকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে পলাশীর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া সিরাজ যখন মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আসিলেন, তখনকার সে চিত্র মনে হইলে হৃদয় কারুণ্য-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি যাহারই

নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন, সে-ই তাঁহার প্রতি বিমুখ হয়। গভীর রাত্রি—মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের ও পলাশীর পথে ইংরেজের সৈন্যগণ সানন্দ-কোলাহলে ও বিজয়-বাদ্যে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে; জয়ভেরীর নিনাদে সিরাজের মর্ম্মস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সিরাজ হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। কোনও কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর কথায় তিনি একবার নগর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন; আবার বিশ্বাস-ঘাতকেরা পরামর্শ দিল, "পলায়ন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।" অনন্যোপায় হইয়া সিরাজ সহগামি-অন্বেষণে অনেকেরই শরণাপন্ন হইলেন। যাহারা তাঁহার চরণ-স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে, আজ সিরাজ তাহাদেরও কৃপার ভিখারী। কিন্তু কেহই তাঁহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এমন কি, তাঁহার শ্বশুরও তাঁহার সহিত এক পদ গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বিপক্ষগণের বিজয়ধ্বনি যতই শ্রুতিপথে আঘাত করে, ততই সিরাজের প্রাণ কম্পিত হইতে থাকে। তখন ভগ্নহৃদয়ে তিনি স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী লুৎফুন্নেসার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। লুৎফুন্নেসা বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া দুইজন দাসীর সহিত স্বামীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন।

অতঃপর বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি ও অধীশ্বরী সামান্য যানে আরোহণ করিয়া নিশীথে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। নৈশান্ধকার তাঁহাদের পলায়নে সহায়তা করিল। মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও পেচকের বিকট আরাব তাঁহাদের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে, নিকটে কোনও শব্দ শুনিলে মীরজাফরের চর মনে করিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন—এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ তাঁহারা ভগবানগোলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে নিদাঘ-তপন ক্রমশঃ প্রচণ্ড কিরণ ছড়াইতে লাগিল; রৌদ্রে ও রৌদ্রতপ্ত ধূলিতে সিরাজের কমনীয় মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; স্বেদজলে তাঁহার ললাট ও গণ্ডস্থল সিক্ত হইল। লুৎফুন্নেসা স্বামীর ক্লেশ-নিবারণার্থ অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজের শরীর সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই; কিসে স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবেন. সেই চিন্তাতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে তাঁহারা ভগবানগোলায় উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে নৌকারোহণে রাজমহল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া চির-সুখাভ্যস্ত সিরাজের মনে প্রবল ভীতির সঞ্চার হইল ; কিন্তু লুৎফুন্নেসা তাহাতে বিচলিত হইলেন না। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণীকে একেবারে রসাতলে প্রেরণের উপক্রম করিতে লাগিল। সিরাজ জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া ভীত-ত্রস্ত হইতে লাগিলেন ; কিন্তু লুৎফুন্নেসা তাঁহার সন্তাপিত হৃদয় শান্ত করিতে যত্নবতী হইলেন। মধ্যে মধ্যে নিদাঘের বৃষ্টি তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সঙ্গে চারি বৎসরের একমাত্র বালিকা কন্যা উম্মৎ জহুরা। সিরাজ এক একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিয়া আকুল হন—পাছে তাঁহার সর্ব্বস্ব-ধন পদ্মার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। কিন্তু লুৎফুন্নেসা কন্যার প্রতি দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া স্বামীর জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া তাঁহারা রাজমহলের নিকটে উপস্থিত হন। দানাশাহ্ নামে এক ফকীর তাঁহাদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিবার ভার লয়। কিন্তু সে গোপনে মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমকে সংবাদ দেয়, এবং তিনি সিরাজকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। মীরকাসিমের অনুচরবগ সিরাজের যাবতীয় ধনরত্ন অপহরণ করে ; আর তিনি স্বয়ং লুৎফুন্নেসার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার পর, হতভাগ্য সিরাজ মীরনের আদেশক্রমে মোহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া খোশবাগের বৃক্ষচ্ছায়ায় চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার কথা মনে হইলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠে। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বেগমকে তদীয় কন্যাদ্বয় ঘসেটী ও আমিনার সহিত চির-নির্ব্বাসিত করা হয়। পতি-বিয়োগবিধুরা অভাগিনী লুৎফুন্নেসাও স্বীয় চারি বৎসরের কন্যা উম্মৎ জহুরাকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়া প্রথমে কারারুদ্ধ ও পরে নির্ব্বাসিত করা হয়।

কিছুকাল ঢাকায় বাস করিবার পর লুৎফুন্নেসা ইংরেজদিগের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদে পুনরানীত হইয়া নবাব আলীবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধি-ভবন

খোশ্‌বাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন; উক্ত তত্ত্বাবধানের জন্য মাসিক ৩০৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তিও পাইতেন। আজীমাবাদস্থ হাজী আহ্‌মদের সমাধির তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম স্বামী ধরণীগর্ভে শায়িত; অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও একে একে অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন; এই বিশাল বিশ্বে তিনি একাকিনী—একটিমাত্র বালিকা কন্যা অবলম্বন। এইরূপ অবস্থাতেও তিনি প্রতিদিন গিয়া স্বামীর সমাধি-বন্দনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। স্বর্ণ-রৌপ্যময় পষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র-দ্বারা সে সমাধি আচ্ছাদিত ছিল। তিনি তথায় প্রতিনিয়ত দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিতেন, এবং উদ্যানের সুগন্ধি কুসুম চয়ন করিয়া সেই অশ্রুজলসিক্ত কুসুমরাশি প্রিয় পতির সমাধির উপর ছড়াইয়া দিতেন। সে সময়ে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তিনি ভূতলশায়িনী হইয়া পড়িতেন। এইরূপেই একদিন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল এবং তিনি স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে এই যন্ত্রণাময় জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। খোশ্‌বাগে সিরাজের পদতলে তাঁহার সমাধি আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাজা উদয়নারায়ণ

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ঘোর রাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। সম্রাট্ ঔরঙ্গ্‌জেবের মৃত্যুর পর মোগল-গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল। তদীয় পুত্রগণ পরস্পর কলহে উন্মত্ত; দাক্ষিণাত্যে বীরেন্দ্রকেশরী শিবাজী যে বীর-জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশ্ব-বিস্ময়কর প্রতাপে মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য উদ্যত; মধ্যস্থলে রাজপুতগণ রাণা রাজসিংহের নেতৃত্বে আপনাদিগের স্বাধীনতা দৃঢ়ীভূত করিতে বদ্ধপরিকর; আবার পঞ্চনদের নদী-বিপ্লাবিত

প্রদেশ হইতে এক ধর্ম্মপ্রাণ জাতির অভ্যুদয় হইতেছিল, যাহারা 'শিখ' নামে অভিহিত হইয়া উত্তরকালে মোগল ও ব্রিটিশ রাজত্বে সমরাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল। ভারতের চতুর্দ্দিকে ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিক্‌গণ বাণিজ্য-বিস্তারচ্ছলে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিকে করতলগত করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প আঁটিতেছিলেন। এই সময়ে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার সিংহাসনে সমাসীন; প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী মুর্শিদাবাদ তাঁহার রাজধানী। অল্পকাল হইল, তিনি নায়েব-নাজিমীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজীমু-শ্‌-শান বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার পুত্র ফর্‌রোখ্‌-স্যের নাম-মাত্র প্রতিনিধি হইয়া বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বস্তুতঃ মুর্শিদকুলী খাঁ সর্ব্বেসর্ব্বা; এতদিন কেবলমাত্র দেওয়ানীর ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, তিনি স্বীয় প্রভুত্ব অধিক পরিমাণে বিস্তার করিতে পারেন নাই; এক্ষণে নায়েব-নাজিমী পদ লাভ করিয়া, তিনি বঙ্গদেশে আপন শাসন-নীতি প্রচারের উদ্‌যোগ করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা জমীদারগণ তাঁহার শাসনদণ্ডের কঠোরতা বিশেষরূপে অনুভব করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের ভীষণ দুর্ব্ব্যবহারে বাঙ্গলার জমীদারগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এই কর্ম্মচারীদের মধ্যে নাজির আহ্‌মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ সর্ব্বপ্রধান। যাঁহার এক কপর্দ্দকও রাজস্ব বাকি পড়িত, তাঁহাকে নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করিতে হইত। এই অত্যাচার অসহ্য হওয়ায়, বাঙ্গলায় দুই জন হিন্দু-বীরের অভ্যুদয় হইল—এক জন ভূষণার জমীদার রাজা সীতারাম রায়, অপর জন রাজশাহীর জমীদার রাজা উদয়নারায়ণ রায়। সীতারাম রায়ের বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু উদয়নারায়ণের বিষয় সকলে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহেন।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় মুর্শিদাবাদের বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী বড়নগর রাণী ভবানীর প্রিয় বাসস্থান ছিল; বিনোদ তাহারই নিকটে অবস্থিত। এই বড়নগরই উদয়নারায়ণের রাজধানী। উদয়নারায়ণ-বংশীয়দের উপাধি ছিল 'লালা'; এই লালা-উপাধি হইতে তাঁহাদিগকে কায়স্থ-বংশসম্ভূত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ; কোন বিশেষ কারণে

তাঁহাদের লালা-উপাধি হইয়া থাকিবে। উদয়নারায়ণের পত্রের নাম সাহেবরাম। যৎকালে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে উদয়নারায়ণের উপর এক বিস্তীর্ণ জমীদারী-শাসনের ভার ছিল ; সমগ্র রাজশাহী চাকলা তাঁহার দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহার জমীদারী পদ্মার উভয় পারে বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা এবং রাজশাহী-বিভাগস্থ দুই একটি জেলার অধিবাসিগণ তাঁহাকে রাজস্ব প্রদান করিত। তাঁহার সমস্ত জমীদারীর নামই রাজশাহী। এক্ষণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজশাহী নামে যে এক-একটি পরগনা দৃষ্ট হয়, তাহাও উদয়নারায়ণের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার জমীদারী যে পদ্মার উভয় পারে বিস্তৃত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ জমীদারগণকে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, কতিপয় আমীন নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা রাজস্বআদায় করাইতেন। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করিয়া দুই-একজন কার্য্যদক্ষই জমীদারের উপরও রাজস্ব-সংগ্রহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। বহুদূর-বিস্তৃত জমীদারী অনায়াসে শাসন করিতে সমথ হওয়ায়, এবং শাসনকার্য্যে তাঁহার সুনাম থাকায়, তাঁহার প্রতি নবাব মর্শিদকুলী খাঁ প্রথমে সদয় ছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায় সুচতুর, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি বাঙ্গলার নবাবদিগের মধ্যে নিতান্তই বিরল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। উদয়নারায়ণের সৌভাগ্য যে, তিনি মুর্শিদকুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। নবাবের অনুগ্রহে উদয়নারায়ণ রাজস্ব-সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন ; তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; বাঙ্গলার জমীদারগণের মধ্যে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিল। নবাব আরও প্রসন্ন হইলেন। এমন সময়ে উদয়নারায়ণের জমীদারীর মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল। নবাব তাহা অবগত হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ গোলাম মোহম্মদ ও কালিয়া জমাদার নামে দুই জন কার্য্যদক্ষ সেনানীকে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের অধীনে দুই শত সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। উক্ত দুই জনের প্রতি এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে যে, তাহারা রাজার অধীনে থাকিয়া অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে। সৈন্যগণ

রাজশাহী-প্রদেশের চতুর্দ্দিকে গোলযোগ নিবৃত্তি করিতে লাগিল; যে যে স্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল, অল্পকাল-মধ্যে সেই সেই স্থলে শান্তি স্থাপিত হইল। রাজা উদয়নারায়ণের শাসনে এবং গোলাম মোহম্মদের কার্য্য-নিপুণতায় রাজশাহী বাঙ্গলার সকল জমীদারীর আদর্শ হইয়া উঠিল। অন্যান্য জমীদার-গণ উদয়নারায়ণের পন্থানুসরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে নবাবও তাঁহাদিগের উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী কাহারও প্রতি চিরদিন প্রসন্ন থাকেন না। গোলাম মোহম্মদের কার্য্যদক্ষতায় উদয়নারায়ণ এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে আত্মীয়ের ন্যায় প্রিয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এই ঘনিষ্ঠতা হইতেই উদয়নারায়ণের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হয়।

গোলাম মোহম্মদ এরূপ কার্য্য-কুশল ছিল যে, রাজা তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। তাহার অধ্যবসায় ও উৎসাহে রাজশাহী-প্রদেশে উদয়-নারায়ণের জমীদারী বদ্ধমূল হইতেছিল; সুতরাং গোলাম মোহম্মদ যে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। উদয়নারায়ণ ও গোলাম মোহম্মদের ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায়, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজা উদয়নারায়ণ যেরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহাতে গোলাম মোহম্মদের ন্যায় কার্য্য-কুশল যোদ্ধা তাঁহার সহায় থাকিলে, পরিণামে ঘোর অনর্থের সম্ভাবনা। সুতরাং নবাব তাঁহাদের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বোধ করিলেন। উদয়নারায়ণের সৈন্যগণ অনেক দিন হইতে বেতন পাইতেছিল না। তৎকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সৈন্যদিগের বেতন বাকি পড়িলে, তাহারা প্রজাগণের নিকট হইতে উহা আদায় করিবার অনুমতি পাইত। উদয়নারায়ণের সৈন্যগণ সেই অনুমতি পাইল; কিন্তু ইহাতে রাজশাহী-প্রদেশে ঘোর অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল। সৈন্যগণ নিরীহ প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল; নিঃসহায় দরিদ্র প্রজাবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি এই সুযোগে গোলাম মোহম্মদ ও উদয়নারায়ণকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ গোলাম মোহম্মদের এতদূর বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি সৈন্যগণের অত্যাচারের কোনরূপ প্রতিবিধান করেন নাই।

এই ছলে নবাব উভয়কেই শাস্তি-প্রদানের সঙ্কল্প করিলেন; এতদ্ব্যতীত, অনেক দিন হইতে রাজশাহী-প্রদেশের রাজস্ব সদরে প্রেরিত হয় নাই। অচিরে মোহম্মদ জান (মতান্তরে, লহরীমাল) নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বাধীনে এক দল সৈন্য রাজশাহী-প্রদেশে প্রেরিত হইল। রাজা উদয়নারায়ণ এই সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপ সামান্য কারণে নবাবের বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় তিনি চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। গোলাম মোহম্মদ তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নানা প্রকার উৎসাহ-বাক্য শুনাইতে লাগিল। মুর্শিদ-কুলীর অন্যায় ব্যবহার ও জমীদারগণের প্রতি অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া, গোলাম মোহম্মদ রাজাকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। রাজার অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ কালিয়া জমাদারও নিতান্ত নীরব ছিল না। উভয় সৈন্যাধ্যক্ষ রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল; সেই কারণেই তিনি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইলেন। বিশেষতঃ রাজাকে সৈন্যগণের অত্যাচার নিবারণ করিতে অনুরোধ না করিয়া, কিংবা সে বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া, নবাব যখন একেবারে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তখন তিনি নবাবের গূঢ় উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার যে যশোগরিমা দিন দিন নব-শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল, নবাব তাহারই ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি গোলাম মোহম্মদের কথায় সম্মত হইলেন, এবং উত্তেজিত হইয়া দুর্ব্বার ভাগীরথী-প্রবাহ-তুল্য অদম্য নবাব-সৈন্যের সমক্ষে সামান্য শৈলবৎ দণ্ডায়মান হইলেন; ফলে, সেই প্রবল স্রোতে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া যাইতে হইল। উভয় সেনাপতির সহিত পরামর্শের অল্পকাল পরে উদয়নারায়ণ বড়নগর পরিত্যাগ করিয়া সুলতানাবাদের (বর্ত্তমানে সাঁওতাল পরগনার) অন্তর্গত বীরকিটি নামক স্থানে তাঁহার সুরক্ষিত বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুরের গড়ে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন।

নবাব-সেনাপতি মোহম্মদ জান (বা লহরীমাল) সসৈন্যে বীরকিটি গ্রামের নিকটস্থ হইলে, গোলাম মোহম্মদও তথায় শিবির-সন্নিবেশ করে।

সুবিখ্যাত বীর রঘুরাম (নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) লহরীমালের সহিত উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে রাজশাহী যাত্রা করিয়াছিলেন। [রঘুরামের পিতা রাজা রামজীবন রাজস্ব-প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; পুত্র রঘুরামও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। যোদ্ধা বলিয়া রঘুরামের বিশেষ খ্যাতি ছিল ; সাধারণে তাঁহাকে 'রঘুবীর' বলিয়া জানিত। রঘুরাম নবাবের আদেশক্রমে লহরীমালের অনুবর্ত্তী হন।] গোলাম মোহম্মদের সৈন্যগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া লহরীমাল অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি উদয়নারায়ণ ও গোলাম মোহম্মদ উভয়কে উত্তমরূপে জানিতেন ; উভয়ে একযোগে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার পক্ষে যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

বীরকিটির নিকটে শিবির-সন্নিবেশের পর, লহরীমাল পাঁচ জন মাত্র সৈনিকপুরুষের সহিত রঘুরামকে লইয়া সেখান হইতে বহুদূরে গিয়া যুদ্ধ-সংক্রান্ত গোপন-পরামর্শ করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে গোলাম মোহম্মদ অশ্বারোহণে উনিশ জন সৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। ইহাতে লহরীমাল নিরতিশয় ভীত হইলেন। আপনাদিগের সৈন্য দূরে অবস্থান করায়, তিনি গোলাম মোহম্মদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু রঘুরাম লহরীমালকে রণবিমুখ হইতে নিষেধ করিয়া, সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে গোলাম মোহম্মদ নিকটস্থ হইলে রঘুরাম তাহার প্রতি এক তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করেন ; বর্ম্ম ভেদ করিয়া শর গোলাম মোহম্মদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী করিল। গোলাম মোহম্মদ পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিলে, রঘুরাম তাহাকে বারি প্রদান করিয়া শুশ্রূষার্থ আপনাদিগের শিবিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু অচিরকাল-মধ্যে গোলাম মোহম্মদ প্রাণত্যাগ করিল। তাহার সৈন্যগণ নেতৃ-বিহীন হইয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, নবাব-সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। উদয়নারায়ণের রাজবাটীর অর্থাৎ তাঁহার বীরকিটিস্থ বাসভবনের নিকটে ও জগন্নাথপুরের গড়ের সম্মুখে এক পার্ব্বত-প্রান্তরে এই যুদ্ধ হয়। এক্ষণে সে স্থানকে 'মুণ্ডমালা' বা 'মুড়মুড়ের

ভাজা' কহিয়া থাকে। তাহার নিকটে অদ্যাপি দগ্ধ কন্দুকাদি পাওয়া যায়। উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরাম এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গোলাম মোহম্মদের মৃত্যু-সংবাদ রাজা উদয়নারায়ণের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি ও যাবতীয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তিনি একাকী কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি একবার মনে করিলেন, অল্প যে-কিছু সৈন্য আছে, তাহা লইয়া সমরক্ষেত্রে আত্মবিসর্জন দেন; কিন্তু স্বীয় পরিবারবর্গের ধর্ম্মরক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য মনে করিয়া, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা বীরকিটির রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া সপরিবারে অরণ্যে ও পর্ব্বতময় দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে দেবীনগর নামক স্থানে উপস্থিত হন। দেবীনগরেও তাঁহার এক বাসভবন ছিল। প্রবাদ ও প্রচলিত-ইতিহাস অনুসারে, উদয়নারায়ণ দেবীনগরে হংসসরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়া বিষপানে প্রাণ বিসর্জন করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি ও সাহেবরাম বন্দী হইয়া তথা হইতে মুর্শিদাবাদে নীত হন, এবং কারা-যন্ত্রণা-ভোগে তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত হয়। [দেবীনগর সাঁওতাল-পরগনা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। হংস-সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।] উদয়নারায়ণের হস্ত হইতে রাজশাহী-প্রদেশ গ্রহণ করিয়া নবাব রামজীবন ও তাঁহার পুত্র কুমার কালু (কালিকাপ্রসাদ)কে তাহার ভার অর্পণ করেন। রামজীবন নাটোর-রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা।

এইরূপে উদয়নারায়ণের পতন হয়। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত জমীদার তৎকালে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্য তিনি অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নানা-স্থানের দেববিগ্রহ তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বীরকিটি গ্রামের রাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি ও বন-নওগাঁ গ্রামের গিরিধারী মূর্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। নাটোর-রাজগণ অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ বড়নগরে তাঁহারই স্থাপিত মদনগোপাল-মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন।

[অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর এক উদয়নারায়ণের বিবরণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত উদয়নারায়ণ মিত্র-বংশসম্ভূত বঙ্গজ কায়স্থ; পূর্ব্ববঙ্গের উলাইল গ্রাম

তাঁহার জন্মস্থান। তিনি দৌহিত্র-সূত্রে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মিত্র উদয়নারায়ণও অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, নবাব-শ্যালক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে, তিনি নবাবের নিকট স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার আবেদনে উত্তর দেন, "তুমি একটি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিলে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।" উদয়নারায়ণ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, ফরীদের ন্যায় মল্লযুদ্ধে এক ব্যাঘ্র বধ করিয়া অক্ষত-শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কোনও কারণে নবাবের বেগম তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া উঠেন। অবশেষে উদয়নারায়ণ কৌশলক্রমে স্বরাজ্য হস্তগত করেন।]

জগৎশেঠ

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ধনকুবের শেঠ-বংশীয়গণ প্রথমে দারিদ্র্যের কঠোর চক্রে নিপেষিত হইয়া, আপনাদের নিবাসস্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগ্যান্বেষণে বাঙ্গলা রাজ্যে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের উপর সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর করুণাদৃষ্টি নিপতিত হয়। সেই অনুগ্রহ-বলে তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গদী সংস্থাপিত ছিল; বাদশাহ্-নবাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-জমীদার ও বণিক্-মহাজনগণ সেই সকল গদী হইতে প্রয়োজন-অনুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। ইংরেজ-ফরাসীগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত বাণিজ্য-কার্য্য-পরিচালনে সমর্থ হইতেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবগণও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব, কোন ব্যাপারই সেই

ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত কদাচ সুসম্পন্ন হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনীতিক কার্য্য তাঁহাদের পরামর্শ ও সহায়তার উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাব নবাবী পাইয়াছেন, আবার তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে নবাব নবাবী হারাইয়াছেন। তাঁহাদের কটাক্ষমাত্রেই বাঙ্গলার তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লব-সমূহ সংঘটিত হইয়াছে। বাস্তবিক, জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার সমুদয় রাজনীতিক ব্যাপারেরই মূলে ছিলেন।

শেঠ-বংশীয়দের আদি-নিবাস যোধপুরের অন্তর্গত নাগোর-প্রদেশ। তাঁহারা প্রথমে শ্বেতাম্বর জৈন-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তৎপরে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন, পরে তাঁহারা পুনরায় জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, হীরানন্দ নামে তাঁহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ভাগ্য-পরীক্ষার্থ নাগোর হইতে পাটনায় আগমন করেন। হীরানন্দের সম্বল তাদৃশ অধিক ছিল না; কাজেই বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহভাজন হইতে না পারিয়া, হীরানন্দ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। একদিন তিনি ব্যথিতচিত্তে নগরের বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র বন-মধ্যে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যা হইল, তথাপি হীরানন্দ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সহসা একটি আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তাহার একটি প্রকোষ্ঠে জনৈক বৃদ্ধ মৃত্যু-যাতনায় অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। বৃদ্ধের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হীরানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোনরূপ ফলোদয় হইল না; অচিরকাল-মধ্যে বৃদ্ধের ইহজীবনের লীলা শেষ হইল। হীরানন্দের সেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে গৃহের একটি কোণে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া যায়। হীরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রচুর ধন লাভ করেন। এইরূপে তাঁহার ভাগ্যোদয় ঘটে। অল্পকাল-মধ্যে হীরানন্দ বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া, আপনার সাত পুত্রকে ভারতের সাত স্থানে গদীয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ হইতে মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ-দিগের উৎপত্তি।

যৎকালে ঢাকা-নগরী বাঙ্গলার রাজধানী-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে মাণিকচাঁদ ঢাকায় আগমন-পূর্ব্বক আপনার গদী সংস্থাপন করেন। এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন। রাজস্ব-সম্বন্ধে সমুদয় ভার মুর্শিদের হস্তে অর্পিত হওয়ায়, অর্থের প্রয়োজন-বশতঃ মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ঘটে। তাহার পর নবাব আজীমুশ্-শানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, মুর্শিদকুলী ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আপনার বাসস্থান নিরূপণ করেন। তাঁহার সঙ্গে রাজস্ব-বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মচারী ও শেঠ মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আসেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার আবাস স্থাপন করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা মহিমাপুরেই বাস করিতেছেন। মুর্শিদকুলী খাঁর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলীকে সকল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলী বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নিজামতী-পদ প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে যে টাঁকশাল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা মাণিকচাঁদের পরামর্শ-অনুসারেই হইয়াছিল।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মাণিকচাঁদের বিশেষরূপ সৌহৃদ্য থাকায়, তিনি বাদশাহ্ ফরুখ্‌সেয়রের নিকট হইতে 'শেঠ' উপাধি আনাইয়া মাণিকচাঁদকে ভূষিত করেন। আবার, শেঠদিগের বংশ-বিবরণীতে এইরূপ দেখা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাঙ্গলার নিজামতী-প্রাপ্তির জন্য মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলীকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, প্রয়োজন-অনুসারে উভয়েই উভয়কে সাহায্য করিতেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকচাঁদ পরলোক-গমন করেন। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে দয়াবাগে তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভ অনেকদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

মাণিকচাঁদ অপুত্রক থাকায় স্বীয় ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে আপনার পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। মাণিকচাঁদের জীবিত অবস্থায় ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন এবং তাঁহার গদীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি প্রকৃত গদীয়ান হইয়া উঠেন। শেঠ-বংশীয়দের মধ্যে ফতেচাঁদই প্রথম 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন বাঙ্গলার সুবেদার-পদ লাভ করেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, প্রধান মন্ত্রী হাজী আহমদ ও রায়-রায়ান আলমচাঁদের পরামর্শ-অনুসারে তিনি সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শেঠেরা বাঙ্গলার রাজস্ব-বিভাগের পোদ্দারী পদে নিযুক্ত থাকায়, ফতেচাঁদের সাহায্যে নবাব শুজাউদ্দীন ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যতদিন শুজাউদ্দীন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি ফতেচাঁদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে জগৎশেঠ ও রায়-রায়ানের পরামর্শ-অনুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য-পরিচালনের উপদেশ দিয়া যান।

সরফরাজ অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। তিনি জগৎশেঠ বা রায়-রায়ানের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সময়ে সময়ে অবমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। নবাব শুজাউদ্দীনের সময় হইতে হাজী আহমদ প্রধান মন্ত্রীর ও তাহার ভ্রাতা আলীবর্দ্দী খাঁ আজীমাবাদের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। সকলে অবমানিত হওয়ায়, সরফরাজের পরিবর্ত্তে আলীবর্দ্দীকে সিংহাসন-প্রদানের জন্য হাজী আহমদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাহাদের ষড়যন্ত্র অবশেষে কার্য্যে পরিণত হয়।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে ফতেচাঁদের তিন পুত্র জন্মে। আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক-গমন করায়, পৌত্র মহতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদকে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। মহতাবচাঁদ আনন্দচাঁদের ও স্বরূপচাঁদ দয়াচাঁদের পুত্র। বাদশাহের নিকট হইতে মহতাবচাঁদ 'জগৎশেঠ' ও স্বরূপচাঁদ 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে শেঠদিগের সৌভাগ্য চরম-সীমায় উপনীত হয়। শেঠদিগের গদীতে সর্ব্বদাই ১০ কোটি টাকার কারবার চলিত। জমীদার, মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সকলেই অর্থের জন্য শেঠদিগের নিকট উপস্থিত হইতেন। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিক্‌গণও তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইতেন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ জগৎশেঠ মহতাবচাঁদকে যথেষ্ট সমাদর

করিতেন, এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে কখনও দ্বিধাবোধ করিতেন না। এই সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত বারংবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তজ্জন্য যখনই তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইত, শেঠেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, এবং তিনি শেঠদিগের পরামর্শ ব্যতীত কখনও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন না। আলীবর্দ্দী তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে শেঠদিগের পরামর্শ-অনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া যান। আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে, সিরাজ বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত মাতামহের উপদেশ-পালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন চলিতেছিল। জগৎশেঠ মহ্‌তাবচাঁদও অবশেষে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। সিরাজ অত্যন্ত অস্থির-বুদ্ধি ও চঞ্চল-প্রকৃতি ছিলেন। যাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তিনি সকল সময়ে তাহা করিতে পারিতেন না। তাঁহার কটুবাক্য-প্রয়োগে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি স্বার্থপর লোকও আপনাদিগের স্ব' -সিদ্ধির জন্য সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, কোন নতন নবাব মস্‌নদে উপবিষ্ট হইলে, জগৎশেঠ দিল্লী হইতে তাঁহার সনদ আনাইয়া দিতেন। সিরাজের সিংহাসনারোহণের সময়ে সনদ আনীত হয় নাই। সিরাজ সনদ না পাওয়ায়, তাঁহার জ্যেষ্টতাত সৈয়দ আহ্‌মদ ও মাতৃষ্বসা ময়মুনা বেগমের পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গ বাঙ্গলার সুবেদারী-লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। মোহনলাল, মীরজাফর প্রভৃতিকে শওকৎজঙ্গের দমনে পাঠাইয়া, সিরাজ জগৎশেঠকে সনদ না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু জগৎশেঠ রাজকোষে অর্থাভাব ব্যতীত ইহার অপর কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পারিলেন না। এই অবহেলার দণ্ড-স্বরূপ সিরাজ জগৎশেঠকে বণিক্‌-মহাজনদিগের নিকট হইতে তিন কোটি টাকা অবিলম্বে সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রদান করিবার জন্য আদেশ দিলেন। জগৎশেঠ

পীড়িত লোকদিগকে পুনর্ব্বার পীড়ন করিয়া অর্থ-শোষণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এইজন্য তিনি নবাবের আদেশের প্রতিবাদ করায়, সিরাজ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। মীরজাফর প্রভৃতি পূর্ণিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জগৎশেঠকে মুক্তি দিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাব তাঁহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই; পরে ক্রোধের উপশম হইলে তিনি জগৎশেঠকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। এই রূপে অবমানিত হওয়ায় জগৎশেঠ সিরাজের উচ্ছেদ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দিল্লীর বাদশাহ্ যাঁহাদিগকে বংশানুক্রমে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সিরাজের ন্যায় চঞ্চল-মতি নবাবের কৃত ঈদৃশ ঘোর অপমান কদাচ সহ্য করিতে পারেন না। এই অবমাননায় জগৎশেঠের মনোমধ্যে প্রতিহিংসার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই অগ্নি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সিরাজের সহিত বাঙ্গলার মুসলমান-রাজ্য ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

যৎকালে জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি সিরাজের দমনার্থ সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি একমত হইয়া ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, আমীরচাঁদের (মতান্তরে, আমীনচাঁদ বা উমিচাঁদ—কলিকাতার একজন পাঞ্জাবী মহাজন ও জগৎশেঠের ব্যবসায়-প্রতিনিধি) দ্বারা জগৎশেঠ সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতেন। ক্রমে ক্রমে যখন এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাব বুঝিতে পারিলেন, তখন জগৎশেঠও সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তিনি ইংরেজদিগের হইয়া নবাব-দরবারে আর কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেন না।

য়ার লতীফ খাঁ নামে নবাবের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অধীনে দুই সহস্র অশ্বারোহী শেঠদিগের প্রদত্ত বৃত্তির দ্বারা প্রতিপালিত হইত। নবাব শেঠদিগের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হওয়ায়, য়ার লতীফ সেই বৃত্তির জন্য তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ইংরেজদিগকে গোপনে

সংবাদ দেন যে, যদি ইংরেজেরা তাঁহাকে নবাবী প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন, এবং সে বিষয়ে শেঠেরা তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন। এই সময়ে মীরজাফরও নবাবীর আশায় ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন; তিনিও জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ইংরেজদিগকে অবগত করান। ইংরেজেরা মীরজাফরের প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু তাঁহারা য়ার লতীফকেও হস্তচ্যুত করেন নাই। তাহার পর পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজেরা জয়ী হইয়া মীরজাফরকে মসনদে বসাইলেন।

মীরজাফরের সিংহাসনে উপবেশন করার পর ইংরেজেরা বাঙ্গলার একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহারা আপনাদিগের লাভালাভের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। আপনাদিগের সুবিধার জন্য তাঁহারা কলিকাতায় একটি টাঁকশাল স্থাপন করিলেন। সেই টাঁকশালের মুদ্রিত মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখনও সমস্ত বঙ্গদেশে এবং বাদশাহের নিকটে পর্য্যন্ত জগৎশেঠদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কলিকাতায় টাঁকশাল হওয়ায় মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়; কাজেই জগৎশেঠদিগেরও লাভে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে মুদ্রা-প্রচলনের ভার জগৎশেঠের হস্তে থাকায়, প্রথম প্রথম কেহ মুর্শিদাবাদের মুদ্রিত টাকার পরিবর্ত্তে কলিকাতার মুদ্রিত টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইত না।

জগৎশেঠের সাহায্যে মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরেজদের দুর্নিবার অর্থ-পিপাসা মিটাইবার জন্য শেঠদিগের নিকট হইতে তাঁহাকে প্রতিনিয়ত ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। অর্থের জন্য অবিরত শেঠদিগকে পীড়াপীড়ি করায়, ক্রমে নবাবের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই সময়ে শাহ্জাদা আলী গওহর (পরে 'বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্-আলম' নামে খ্যাত) বাঙ্গলা-রাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বিহারে উপস্থিত হন। শাহ্জাদার বিহারে অবস্থিতি-কালে জগৎশেঠ মহ্তাবচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগের তীর্থস্থান

পরেশনাথে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদেরই বৃত্তিভোগী দুই সহস্র নবাব-সৈন্য গমন করিতেছিল। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, নবাব তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করেন। তৎকালে এক জনরব রটিয়াছিল যে, জগৎশেঠেরা নবাবের বিরুদ্ধে শাহ্জাদার সহিত যোগদান করিতেছেন; নবাব এই জনরবে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা পান। শেঠেরা নবাবের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই দুই সহস্র সৈন্যকে বশীভূত করিয়া ফেলেন, এবং তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া, সঙ্গে লইয়া তীর্থাভিমুখে অগ্রসর হন। ভবিষ্যতে অমঙ্গল হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া, নবাব তাঁহাদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে বা তাঁহাদিগের গদী লুণ্ঠন করিতে সাহসী হন নাই। পরে আবার শেঠদিগের সহিত নবাবের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়।

মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইলে, তাঁহার জামাতা কাসিম আলী খাঁ (মীরকাসিম) বাঙ্গলার মস্নদে উপবিষ্ট হন। সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে কাসিম আলী ইংরেজদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের ও জগৎশেঠের পরামর্শ-অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। বাণিজ্যের শুল্ক-ঘটিত ব্যাপার লইয়া ক্রমশঃ ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসিমের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ বরাবরই ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। এ-ক্ষেত্রেও যে তিনি তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন না করিয়াছিলেন, এমন নহে। মীরকাসিম অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন; তিনি মীরজাফরের ন্যায় ভীরু-প্রকৃতি অথবা সিরাজুদ্দৌলার ন্যায় চঞ্চল-মতি ছিলেন না। ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জগৎশেঠ তাঁহাদিগের পূর্ণ-সহায়তা করিতেছেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মীরকাসিমের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ও জাফর আলী খাঁকে যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহার কতকগুলি মীরকাসিমের হস্তগত হয়। এজন্য নবাব জগৎশেঠ মহতাব-চাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মোহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকী খাঁ তাঁহাদিগকে কোনরূপ অবমানিত না করিয়া হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। পরে নবাবের আদেশে তাঁহার আর্ম্মেনীয় সেনাপতি মার্কার তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, তকী খাঁ তাঁহাদিগকে মার্কারের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে

নবাব কাসিম আলী খাঁ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। মার্কার তাঁহাদিগকে লইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। নবাব শেঠদিগের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে একটি কুঠী স্থাপন করিয়া তথায় স্বাধীনভাবে থাকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে ইংরেজদিগের সহিত শেঠদিগের কুমন্ত্রণা পুনর্ব্বার আরম্ভ হয়, তজ্জন্য যাহাতে তাঁহারা অধিক দূরে যাইতে না পারেন, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিতে স্বীয় অনুচরদিগকে আদেশ দেন।

তৎকালে ভান্সিটার্ট কলিকাতার গবর্নর ছিলেন। তিনি বরাবরই মীরকাসিমকে শ্রদ্ধা করিতেন। ইংরেজদিগের সহিত বিবাদে ভান্সিটার্ট প্রথমে মীরকাসিমের পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ক্রমে যখন বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে, তখন তিনি নবাবকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন।

নবাব জগৎশেঠকে বন্দী করিলে, ভান্সিটার্ট বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। তিনি আমিয়ট-এর নিকট হইতে জগৎশেঠ দিগের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। আমিয়ট তৎকালে কাসিমবাজারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গবর্নর নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি এইমাত্র আমিয়ট-এর পত্রে অবগত হইলাম যে, মোহম্মদ তকী খাঁ রজনীতে জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় হীরাঝিলে আনিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। যখন আপনি শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন আপনি, জগৎশেঠ ও আমি সমবেত হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেঠেরা বংশ-মর্য্যাদায় দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া, শাসন-কার্য্যের বন্দোবস্তে আপনাকে তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আপনিও তাঁহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে স্বীকৃত হন। মুঙ্গেরে আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে আমি শেঠদিগের কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম এবং আপনিও তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি করিবেন না বলিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করেন। তাঁহাদিগকে এরূপভাবে গৃহ হইতে আনয়ন করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে ; ইহাতে তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করা হইয়াছে। আপনার এরূপ ব্যবহারে আমাদের সন্ধি-ভঙ্গ হইয়াছে এবং আপনার ও আমার সুনামে কলঙ্ক পড়িয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কোন নাজিম শেঠদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন

নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য আপনি সৈয়দ মোহম্মদ খাঁ বাহাদুর (মুর্শিদাবাদের ফৌজদার)কে লিখিয়া পাঠাইবেন।"

নবাব ইহার এক সুদীর্ঘ উত্তর লিখিয়া পাঠান। তাহাতে অনেক কথা লিখিত থাকে; তন্মধ্যে শেঠদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ, "শেঠেরা ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে আনিতে পাঠাই নাই। যখন আমি শাসনভার গ্রহণ করি, তখন শেঠেরা আমার সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু তিন বৎসর তাহারা আমার কোনরূপ সাহায্য করে নাই এবং আপনাদিগের কারবারও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করে নাই। আমি যখনই তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, তখনই তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে এবং আমাকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছে। এক্ষণে আমার কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগের উপস্থিতি বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া, আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনারা প্রতিদিন সিপাহী পাঠাইয়া আমার আমীন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগের উপর অযথা অত্যাচার করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেছেন। আপনাদের ঐরূপ ব্যবহারে সন্ধি-ভঙ্গ হয় না, অথচ আমি আমার অধীন লোক-দিগকে নিজের প্রয়োজনের জন্য আহ্বান করিলে, অমনি সন্ধি-ভঙ্গ হইয়া যায়; আমি তাহাদিগকে সরকারের ও তাহাদের নিজের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য মুঙ্গেরে আনয়ন করিয়াছি; তাহাদিগকে এখানে আনিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসিমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে। নবাব কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হন, এবং মুঙ্গেরে আসিয়া জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দী কর্ম্মচারী এবং রাজা ও জমীদারদিগের বিনাশ-সাধন করেন। জগৎশেঠ মহ্‌তাবচাঁদকে অত্যুচ্চ দুর্গ-প্রাকার হইতে গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিমজ্জিত করা হয়। মহারাজ স্বরূপচাঁদকেও ঐ ভাবে হত্যা করা হয়।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী-গ্রহণের পর হইতে শেঠদিগের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। এককালে যে জগৎশেঠগণ মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-তুল্য-প্রদীপ্ত-প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে গৌরবজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরগণ

অতি দীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। জগৎশেঠদিগের সুদূর-বিস্তৃত বাসভবন এক্ষণে ভগ্নদশায় নিপতিত। অনেক স্থানের চিহ্নমাত্রও নাই। ভাগীরথী ইহার অধিকাংশই গ্রাস করিয়াছে। ঠাকুর-বাটীর প্রাঙ্গণে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরের কয়েকটি বহুমূল্য স্তম্ভ ও চৌকাঠের শিল্প-নৈপুণ্য আজিও সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে। এই পার্শ্বনাথের মন্দির ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে জগৎশেঠগণ সেই মন্দিরে পূজা-উপাসনাদি করিতেন। অন্তঃপুর হইতে পার্শ্বনাথের মন্দিরে ও বর্ত্তমান গোবিন্দদেবের মন্দিরে যাইবার জন্য সুরঙ্গ ছিল; এক্ষণে তাহার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাটীর পশ্চাতে কতকগুলি উচচ ভিত্তি দৃষ্ট হয়; তথায় জগৎশেঠগণের বৈঠকখানা ছিল। সেই সমস্ত ভিত্তি এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তথায় একটি চৌবাচচা দেখা যায়; তাহার কিয়দংশ আজিও কষ্টিপাথরে মণ্ডিত রহিয়াছে। এই বৈঠকখানার পশ্চাতে ভাগীরথী-তীরে কতকগুলি আম্রবৃক্ষের শ্রেণী আছে। শুনা যায়, সেই স্থানে জগৎশেঠদিগের গদী বা বাণিজ্যাগার ছিল; তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা রক্ষিত হইত। এক্ষণে তাহার ভিত্তিরও চিহ্ন-মাত্র নাই। ইহাদের সন্নিকটে একটি অর্দ্ধ-ভগ্ন চৌদুয়ারী আছে; এই চৌদুয়ারীর উত্তর-দ্বার দিয়া জগৎশেঠদিগের ভবনে, পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া ঠাকুর-বাটীতে, দক্ষিণ-দ্বার দিয়া খোশালবাগে এবং পশ্চিম-দ্বার দিয়া ভাগীরথী-তীরে গমন করা যায়।

যে জগৎশেঠদিগের নাম ও গৌরব এক কালে সমগ্র ভারতে বিঘোষিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের সে নাম ও গৌরবের সহিত তাঁহাদের বাসভবনের ও অন্যান্য কীর্ত্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে; তাহাদের সমস্তই এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসিয়া জগৎশেঠ-দিগের বংশধরগণ কালের বিস্ময়করী লীলা সন্দর্শন করিতেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার

মহারাজ নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত বাড়ালা গ্রামের নিকট জরুল নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা রাঢ়ীয়-শ্রেণী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। মহারাজের প্রপিতামহ রামগোপাল রায় ভদ্রপুরে (অধুনা বীরভূম জেলার অন্তর্গত) আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভের জন্ম হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-সময়েই হউক, অথবা উহার কিছু পূর্ব্বে বা পরেই হউক, শাহান্-শাহ্ ঔরঙ্গজেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের চতুর্দ্দিকে ঘোর রাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গলা-রাজ্য নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর তর্জ্জনী-তাড়নে কুশলে শাসিত হইতেছিল। তাঁহার রাজস্ব-সম্পর্কীয় জ্ঞান ও দক্ষতার কথা তৎকালে বাঙ্গলা-রাজ্যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং সকলেই মুর্শিদকুলীর দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা পাইতেন। মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভও উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং পুত্র নন্দকুমারকেও বাল্যকাল হইতে সেই বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ যথাসময়ে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি আমীনের পদ লাভ করিয়া ফতেসিংহ, ঘোড়াঘাট ও সাতশইকা পরগণার রাজস্ব-সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্মনাভ রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যের সহায়তার জন্য পুত্র নন্দকুমারকে নিজের নায়েব বা সহকারী নিযুক্ত করেন। রাজস্ব-বিষয়ে নন্দকুমারের দক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব-সময়ে তিনি হিজলী ও মহিষাদলের আমীন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যৎকালে কলিকাতার ইংরেজদিগকে দমন করেন, সেই সময়ে হুগলীতে কোন ফৌজদার ছিল না। পাছে ইংরেজেরা কোনরূপে আবার

অতি দীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। জগৎশেঠদিগের সুদূর-বিস্তৃত বাসভবন এক্ষণে ভগ্নদশায় নিপতিত। অনেক স্থানের চিহ্নমাত্রও নাই। ভাগীরথী ইহার অধিকাংশই গ্রাস করিয়াছে। ঠাকুর-বাটীর প্রাঙ্গণে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরের কয়েকটি বহুমূল্য স্তম্ভ ও চৌকাঠের শিল্প-নৈপুণ্য আজিও সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে। এই পার্শ্বনাথের মন্দির ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে জগৎশেঠগণ সেই মন্দিরে পূজা-উপাসনাদি করিতেন। অন্তঃপুর হইতে পার্শ্বনাথের মন্দিরে ও বর্ত্তমান গোবিন্দদেবের মন্দিরে যাইবার জন্য সুরঙ্গ ছিল; এক্ষণে তাহার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর-বাটীর পশ্চাতে কতকগুলি উচচ ভিত্তি দৃষ্ট হয়; তথায় জগৎশেঠগণের বৈঠকখানা ছিল। সেই সমস্ত ভিত্তি এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তথায় একটি চৌবাচচা দেখা যায়; তাহার কিয়দংশ আজিও কষ্টিপাথরে মণ্ডিত রহিয়াছে। এই বৈঠকখানার পশ্চাতে ভাগীরথী-তীরে কতকগুলি আম্রবৃক্ষের শ্রেণী আছে। শুনা যায়, সেই স্থানে জগৎশেঠদিগের গদী বা বাণিজ্যাগার ছিল; তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা রক্ষিত হইত। এক্ষণে তাহার ভিত্তিরও চিহ্ন-মাত্র নাই। ইহাদের সন্নিকটে একটি অর্দ্ধ-ভগ্ন চৌদুয়ারী আছে; এই চৌদুয়ারীর উত্তর-দ্বার দিয়া জগৎশেঠদিগের ভবনে, পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া ঠাকুর-বাটীতে, দক্ষিণ-দ্বার দিয়া খোশালবাগে এবং পশ্চিম-দ্বার দিয়া ভাগীরথী-তীরে গমন করা যায়।

যে জগৎশেঠদিগের নাম ও গৌরব এক কালে সমগ্র ভারতে বিঘোষিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের সে নাম ও গৌরবের সহিত তাঁহাদের বাসভবনের ও অন্যান্য কীর্ত্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে; তাহাদের সমস্তই এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বসিয়া জগৎশেঠ-দিগের বংশধরগণ কালের বিস্ময়করী লীলা সন্দর্শন করিতেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার

মহারাজ নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত বাড়ালা গ্রামের নিকট জরুল নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা রাঢ়ীয়-শ্রেণী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। মহারাজের প্রপিতামহ রামগোপাল রায় ভদ্রপুরে (অধুনা বীরভূম জেলার অন্তর্গত) আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভের জন্ম হয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম-সময়েই হউক, অথবা উহার কিছু পূর্ব্বে বা পরেই হউক, শাহান্-শাহ্ ঔরঙ্গজেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের চতুর্দ্দিকে ঘোর রাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গলা-রাজ্য নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর তর্জ্জনী-তাড়নে কুশলে শাসিত হইতেছিল। তাঁহার রাজস্ব-সম্পর্কীয় জ্ঞান ও দক্ষতার কথা তৎকালে বাঙ্গলা-রাজ্যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং সকলেই মুর্শিদকুলীর দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা পাইতেন। মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভও উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং পুত্র নন্দকুমারকেও বাল্যকাল হইতে সেই বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ যথাসময়ে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি আমীনের পদ লাভ করিয়া ফতেসিংহ, ঘোড়াঘাট ও সাতশইকা পরগণার রাজস্ব-সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্মনাভ রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যের সহায়তার জন্য পুত্র নন্দকুমারকে নিজের নায়েব বা সহকারী নিযুক্ত করেন। রাজস্ব-বিষয়ে নন্দকুমারের দক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব-সময়ে তিনি হিজলী ও মহিষাদলের আমীন নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যৎকালে কলিকাতায় ইংরেজদিগকে দমন করেন, সেই সময়ে হুগলীতে কোন ফৌজদার ছিল না। পাছে ইংরেজেরা কোনরূপে আবার

বাঙ্গলায় প্রবেশ করেন, সেইজন্য নবাব মাণিকচাঁদকে কলিকাতায় ও মীর্জা মোহম্মদ আলীকে হুগলীতে ফৌজদার-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুগলীর ন্যায় প্রসিদ্ধ বন্দরের শাসন-কার্য্য মীর্জা মোহম্মদ আলীর দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন মনে করিয়া, সিরাজ শেখ ওমারুল্লাকে হুগলীর ফৌজদারী প্রদান করেন। নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ানীর জন্য আবেদন করিলে, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। কিছুদিন পরে ওমারুল্লার পদচ্যুতি ঘটে। তখন নবাব সিরাজুদ্দৌলা নন্দকুমারকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া, তাঁহাকেই হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে কর্নেল ক্লাইব ফরাসীদিগের নিকট হইতে চন্দননগর অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চন্দননগর অধিকার করিতে গেলে, নবাবের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, এবং তাহার ফলে নবাবের প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজেরা নবাবের রাজ্যে কোনরূপ গোলযোগ করিবেন না বলিয়া সন্ধি-সূত্রে প্রতিশ্রুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সে প্রতিশ্রুতি ক্রমে ক্রমে ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। নবাব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ইংরেজদিগকে চন্দননগর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া, রাজা দুর্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য হুগলীতে পাঠাইয়া দিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে ফরাসীদিগের সাহায্য করিবার জন্য নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজেরা দেখিলেন যে, বিষম অনর্থ উপস্থিত; নবাব-সৈন্য যদি সেই সময়ে হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং নন্দকুমারের ন্যায় সুচতুর ফৌজদার যদি ইংরেজদিগের কৌশল বুঝিতে পারেন, আর তিনি যদি ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন, তাহা হইলে চন্দননগর আক্রমণ করা দুরূহ হইবে। এই জন্য তাঁহারা গোপনে আমীরচাঁদ (উমিচাঁদ)কে দিয়া নন্দকুমারকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। আমীরচাঁদ হুগলীতে উপস্থিত হইয়া নন্দকুমারকে ইংরেজদিগের বল-বীর্য্যের কথা জানাইয়া, তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি নন্দকুমারকে জানাইলেন যে, জগৎশেঠ প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান কর্ম্মচারী ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে পক্ষে জগৎশেঠ, সে পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী, এবং সিরাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও দেশের সকলে ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত; এরূপ ক্ষেত্রে সিরাজের

রাজ্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব, স্বীয় ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের জন্য ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপন করা তাঁহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

এই সকল কারণে, নন্দকুমার সিরাজের ভবিষ্যৎ ঘোরতর অন্ধকারময় বুঝিতে পারিয়া, ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপনের প্রয়াস করিলেন। তিনি নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজেরা যেরূপ শক্তিশালী, তাহাতে ফরাসীদিগের সাহায্য করিতে গেলে, অবমাননার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং ফরাসীদিগের সাহায্য করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে না। অতঃপর নন্দকুমার ফরাসী-দিগের কোনরূপ সহায়তা না করায়, ইংরেজেরা সহজেই চন্দননগর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, সিরাজুদ্দৌলা নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে একজন নূতন ফৌজদার হুগলীতে পাঠাইলেন। ইহার পর কিছুদিনের জন্য নন্দকুমারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু অবগত হওয়া যায় না।

মীরজাফর মস্‌নদে বসিলে রায়দুর্লভ তাঁহার দেওয়ান হইলেন। মুতখ্‌খরীনে লিখিত আছে যে, মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করার পর নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্‌শী ও দেওয়ান হন। এ-কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে; কারণ নন্দকুমার ইংরেজদিগের সহায়তা করায়, এবং তাহার ফলে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটায়, ক্লাইব যে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সময়ে ক্লাইব নন্দকুমারের উপর এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তাঁহাকে পুনর্ব্বার হুগলী, হিজলী প্রভৃতির দেওয়ানী প্রদান করিতে নবাবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ক্লাইবের অনুরোধে নবাব নন্দকুমারকে সেই সকল প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে মীরজাফর ইংরেজদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি দেখিলেন যে, রাজকোষ শূন্য। অগত্যা তিনি সে টাকার পরিবর্ত্তে ইংরেজদিগকে বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের রাজস্ব ছাড়িয়া দেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নন্দকুমারকে তাঁহাদিগের অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে ঐ সমস্ত স্থানের তহশীলদার নিযুক্ত করিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে একজন করিয়া রেসিডেন্ট রাখা স্থির হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন

হেস্টিংস উক্ত রেসিডেন্ট-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্দ্ধমান প্রভৃতির রাজস্ব আদায় লইয়া নন্দকুমারের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে; ক্রমে তাহা ভীষণ শত্রুতায় পরিণত হয়।

ক্লাইবের বিলাত-যাত্রার পর ভান্সিটার্ট কলিকাতার গবর্নর নিযুক্ত হইয়া আসেন। প্রথমে তিনি নন্দকুমারের কার্য্য-দক্ষতার জন্য তাঁহার উপর প্রসন্ন হন। কিন্তু এতদ্দেশীয় ইংরেজদিগের কুপরামর্শে ক্রমে নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে। হেস্টিংস ভান্সিটার্ট-এর পরম-বন্ধু ছিলেন; সুতরাং নন্দকুমারের প্রতি ভান্সিটার্ট-এর বিদ্বেষ জন্মাইতে তিনি যে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ভান্সিটার্ট আসিয়া বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাসিমকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদে বসাইলেন।

সিংহাসন-চ্যুত হইয়া নবাব মীরজাফর খাঁ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি নন্দকুমারকে আপনার সমস্ত দুঃখের কথা জানাইলে, ক্রমে নন্দকুমারেরও জ্ঞান-সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরেজেরা এক্ষণে দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিতেছেন; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তাঁহারা নবাব করিতেছেন। তিনি মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের গুপ্ত-ব্যবসায়ের জন্য কোম্পানীর অনেক ক্ষতি ও দেশ-মধ্যে নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার সেই বিষয়ে মীরজাফর খাঁর মোহর-সংবলিত একখানি পত্র ক্লাইবকে ও আর একখানি কোম্পানীকে লিখিয়া বিলাতে পাঠান। উক্ত দুইখানি পত্র কোনক্রমে এখানকার ইংরেজ-কর্ম্মচারী-দিগের হস্তগত হওয়ায়, তাঁহারা নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইংরেজ-কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দুইটি দল হয়; এক দলে ভান্সিটার্ট ও হেস্টিংস, অপর দলে আমিয়ট ও এলিস প্রধান ছিলেন। এই সময় হইতেই নবাব মীরকাসিমেরও ইংরেজদিগের প্রতি বিদ্বেষের সূচনা হয়।

অতঃপর ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসিমের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরেজেরা মীরজাফরকে পুনর্ব্বার নবাবী প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মীরজাফর নন্দকুমারকে ছাড়িতে চাহিলেন না; তিনি নন্দকুমারকে নিজের

দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্য কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই; পরে মীরজাফর খাঁর সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধে তাঁহারা নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান হইবার অনুমতি দিলেন। মীরজাফর তাঁহাকে খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন। মীরকাসিমের পরাজয়ের পর মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন। তিনি বাদশাহ্‌কে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করাইলেন। তদবধি দেওয়ান নন্দকুমার 'মহারাজ নন্দকুমার' নামে অভিহিত হইলেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা পূর্ব্ব হইতেই নন্দকমারের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, এক্ষণে অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নজ্‌মুদ্দৌলা বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদে বসিলেন। নন্দকুমার তাঁহাদের বংশের পরম-হিতৈষী ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকেই দেওয়ান রাখিবার জন্য নজ্‌মুদ্দৌলা কলিকাতা-কাউন্সিলের নিকটে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা তাঁহাদের পরম-শত্রু নন্দকুমারকে নবাবের দেওয়ানী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। ইহার পূর্ব্বে ভান্সিটার্ট বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। ভান্সিটার্ট বিলাতে ফিরিয়া গেলে, ক্লাইব পুনর্ব্বার বাঙ্গলার গবর্নর হইয়া আসিলেন।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ভান্সিটার্ট নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করিয়া গিয়াছিলেন; তাহার ফলে নন্দকুমারের হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক লর্ড ক্লাইবও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। ভান্সিটার্ট যে সকল কাগজে নন্দকুমারের দোষের কথা লিপিবদ্ধ করেন, সেগুলি পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতা জর্জ ভান্সিটার্টকে দেন এবং তাহা কাউন্সিলে পাঠ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া যান। ক্লাইব উপস্থিত হইলে, জর্জ ভান্সিটার্ট সেই পুস্তক কাউন্সিলে পাঠ করিয়াছিলেন। তদবধি ক্লাইব নন্দকুমারের উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কোন উপদেশই তিনি শুনিতেন না। তিনি নন্দকুমারকে দেওয়ানী দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে কলিকাতা হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্লাইব মোহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-সুবার পদ প্রদান করিয়া, তাঁহার সাহায্যের জন্য জগৎশেঠ ও দুর্লভরামকে নিযুক্ত করিলেন।

কার্য্যচ্যুত হইয়া নন্দকুমার এক্ষণে নীরবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সে সময়ে তিনি প্রায়ই কলিকাতায় বাস করিতেন। কলিকাতার যে স্থানে এখন বীডন উদ্যান রহিয়াছে, তথায় নন্দকুমারের আবাস-বাটী ছিল। ইহার নিকটে আজিও একটি 'স্ট্রীট' তাহার পুত্র রাজা গুরুদাসের নাম ঘোষণা করিতেছে। ভারতবর্ষে আসিয়া ক্লাইব ভান্সিটার্ট-শাসনের অনেক প্রকার নিন্দাবাদ শ্রবণ করেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তিনি কাহারও উপর সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে নন্দকুমারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন যে, ভান্সিটার্ট নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুধু বিদ্বেষবশতঃ-ই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি নন্দকুমারকে পুনরায় প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাকে ভান্সিটার্ট-শাসনের একটি আমূল বিবরণ লিখিতে বলিলেন। নন্দকুমার ভান্সিটার্ট-শাসনের দোষত্রুটী-সমূহের এক বৃহৎ তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। ক্লাইব সেই তালিকা লইয়া বিলাতে রওনা হন।

ক্লাইব বিলাতে চলিয়া গেলে, ভেরেলস্ট তাঁহার স্থানে কলিকাতার গবর্নর হইয়া আসেন। ভেরেলস্টের সহিত নন্দকুমারের বিশেষরূপ পরিচয় হয়। কিন্তু বিপক্ষ দল ক্রমশঃ নন্দকুমারের প্রতি তাঁহারও বিরক্তি জন্মাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় আর এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন; তিনি রাজা নবকৃষ্ণ। যখন ক্লাইব নন্দকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, সে সময়ে নবকৃষ্ণ ক্লাইবের অধীনে সামান্য মুন্‌শীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যখন নন্দকুমার ইংরেজদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন তখন হইতে নবকৃষ্ণ তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া ইংরেজ-মহলে আপনার প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় ইংরেজেরা নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ভেরেলস্ট বিলাত-যাত্রা করিলে, কার্টিয়ার তাঁহার স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি ও গবর্নর নিযুক্ত হন। কার্টিয়ার-এর সময়ে ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙ্গলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; ইহাকেই সাধারণতঃ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোক অনাহারে ও বিবিধ রোগের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিল। এই ছিয়াত্তরের

মন্বন্তরের সময়ে বাঙ্গলার নায়েব-সুবা ও নায়েব-দেওয়ান মোহম্মদ রেজা খাঁর অত্যাচারে দেশের লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। সেইজন্য তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান দুইটি বিষয় এই :—রেজা খাঁ দুর্ভিক্ষের সময়ে বাজারের সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখেন এবং অত্যন্ত উচচ মূল্যে সে সমস্ত বিক্রয় করেন ; আর, তিনি সরকারী তহবিলের অনেক অর্থ অপব্যয় ও আত্মসাৎ করেন।

কার্টিয়ার পদত্যাগ করিলে, ওয়ারেন হেস্‌টিংস তাঁহার স্থলে গবর্নর নিযুক্ত হন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে মোহম্মদ রেজা খাঁর বিচার করিতে বলেন। রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য হেস্‌টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিড্‌ল্‌টন্‌-এর প্রতি আদেশ দেন। তদনুসারে মিড্‌ল্‌টন্‌ রেজা খাঁকে তাঁহার বাসস্থান মুর্শিদাবাদের নেশাৎবাগ হইতে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই সময়ে পাটনার দেওয়ান সেতাব রায়েরও একই কারণে বিচার আরম্ভ হয়। মোহম্মদ রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ হইলে, তাঁহার অপরাধ প্রমাণের জন্য হেস্‌টিংস উপযুক্ত লোকের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে নন্দকুমারের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি তখন আর কেহ ছিলেন না। বঙ্গরাজ্যের কি শাসন, কি রাজস্ব, সমস্ত বিষয়েরই তিনি সংবাদ রাখিতেন, এবং যেখানে অত্যাচার ঘটিত, তাহার প্রতিকারের জন্য লোকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই শরণাপন্ন হইত। হেস্‌টিংস নন্দকুমারের প্রতি পূর্ব্ব হইতে বিরক্ত থাকিলেও, উপস্থিত কার্য্যোদ্ধারের জন্য, মোহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ-সংগ্রহের কার্য্যে তাঁহাকেই নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যাপারে নন্দকুমার প্রভূত পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু এদিকে রেজা খাঁ গোপনে হেস্‌টিংসকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। প্রায় দুই বৎসর বিচারের পর রেজা খাঁ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। রেজা খাঁকে নিষ্কৃতি পাইতে দেখিয়া জনসাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; নন্দকুমারও হেস্‌টিংস-চরিত্র বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন।

ইহার পর হইতে দেশ-মধ্যে হেস্‌টিংস-এর অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্তবাবু, দেবীসিংহ প্রভৃতি দেশীয় ব্যক্তিগণ হেস্‌টিংস-এর অনুচর হইয়া উঠিলেন ; নবকৃষ্ণ, রেজা খাঁ প্রভৃতিও তাহাতে যোগ দিলেন। দেশের অবস্থা দেখিয়া নন্দকুমার অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও দুঃখিত

হইলেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি একরূপ ক্ষমতাহীন—কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কি জমীদার, কি প্রজা, সকলে আসিয়া তাঁহার নিকটে নিজেদের উপর অত্যাচারের কথা জানাইতে আরম্ভ করিল। তিনি তাহাদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া, স্বীয় ক্ষমতা-হীনতার কথা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। নন্দকুমারের নিকটে সাধারণের গতিবিধি এবং রেজা খাঁর অত্যাচার-কাহিনী-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাহাদের আলোচনার কথা অবগত হইয়া, হেস্টিংস ও তাহার অনচরবর্গ ক্রমে নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর বিরোধের সৃষ্টি হইল। হেস্টিংস নন্দকুমারের উপর যেটুকু প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নন্দকুমারও তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত হইল।

পলাশী-যুদ্ধের পর যখন বঙ্গরাজ্যে ইংরেজদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হয়, তদবধি দেশ-মধ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অযথা প্রভুত্ব ও অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডে পেঁাছিলে, ব্রিটিশ-জাতির হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তাঁহারা নিরীহ ভারতবাসিগণের প্রতি অত্যাচার-নিবারণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। এই উদ্দেশ্যে, ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ-এর মন্ত্রিত্ব-কালে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টে একটি শাসন-সংক্রান্ত আইন (Regulation Act) বিধিবদ্ধ হয়; তদ্দ্বারা বাঙ্গলার গবর্নরকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনারেল করা হয় এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য চারি জন কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। অত্যাচার-নিবারণ ও দেশে সুবিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়, এবং তাহাতে একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ও অপর তিন জন বিচারক নিযুক্ত হন। গবর্নর-জেনারেল ও চারি জন সভ্যের মধ্যে, বারওয়েল পুর্ব্ব হইতেই এখানে ছিলেন। অন্য তিন জন—ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস—এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পে, ও চেম্বার্স, হাইড ও লেমেস্তুর নামে অপর তিন জন জজ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড হইতে

যাত্রা করিয়া ১৯এ অক্টোবর কলিকাতার চাঁদপাল-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তোপধ্বনি প্রভৃতি-দ্বারা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই নবাগতদিগের মধ্যে, সদস্যগণের সহিত গবর্নরের বিরোধ ও বিচারকদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। ইম্পে হেস্টিংস-এর সহপাঠি-বন্ধু ছিলেন; এই কারণে বিচারকদিগের সহিত সহজেই তাঁহার বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এইরূপ পক্ষাপক্ষের ফলে বাঙ্গলায় মহা-অনর্থ উপস্থিত হয়, এবং তাহা কোম্পানীর রাজত্বের বিশেষ কলঙ্ক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। নবাগত সদস্যত্রয় দেশের শাসনকার্য্যের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া, হেস্টিংস-এর অত্যাচারের ভূরিভূরি প্রমাণ পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে নন্দকুমারের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহাকে হেস্টিংস-এর সমস্ত দোষের তালিকা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তজ্জন্য নন্দকুমার হেস্টিংস-এর দোষ সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সেই সময়ে বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজ তিলকচাঁদের পত্নী হেস্টিংস-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার পর, নন্দকুমার হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে এক আবেদন-পত্র দাখিল করেন। সেই দিন হইতে হেস্টিংস নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মোহনপ্রসাদ নামে নন্দকুমারের একজন শত্রু সেই সময়ে হেস্টিংস-এর নিকটে গতায়াত করিত। এই মোহনপ্রসাদ বুলাকীদাস শেঠ নামক এক মহাজনের আম-মোক্তার ছিল। বুলাকীদাস একজন আগরওয়ালা বেনিয়া; তিনি প্রায়ই মুর্শিদাবাদে বাস করিতেন। মীরকাসিমের সময় হইতে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মহারাজ নন্দকুমার একছড়া মুক্তার কণ্ঠি, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ ও ৪টি হীরকাঙ্গুরীয় বিক্রয়ের জন্য বুলাকীদাসকে দিয়াছিলেন; সেইগুলির মোট মূল্য ৪৮,০২১ টাকা স্থির হয়। মীরকাসিমের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হইলে, দেশের চারিদিকে লুঠতরাজ হইতে লাগিল; তাহাতে বুলাকী-দাসের বাটীও লুণ্ঠিত হয়, এবং সেই সঙ্গে নন্দকুমারের গচ্ছিত সমস্ত জহরৎ অপহৃত হইয়া যায়। বুলাকীদাস নন্দকুমারকে সেই সমস্ত জহরতের মূল্য-স্বরূপ একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, বুলাকীদাস নন্দকুমারকে জহরতের মূল্য-স্বরূপ ৪৮,০২১ টাকা ও প্রত্যেক টাকায় চারি আনা

হিসাবে সুদ দিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং কোম্পানীর নিকটে বুলাকীদাসের যে দুই লক্ষেরও অধিক টাকা পাওনা আছে, তাহা পাইলেই সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিবেন। বুলাকীদাসের মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার, উক্ত অঙ্গীকারের বলে, কোম্পানীর নিকট বুলাকীদাসের পাওনা টাকা হইতে সম্পত্তির এক্‌জিকিউটার পদ্মমোহন দাসের সম্মতিক্রমে সেই টাকা পরিশোধ করিয়া লন। মোহনপ্রসাদ এ সমস্ত বিষয়ই জানিত। ক্রমে ক্রমে অঙ্গীকার-পত্রের সমস্ত সাক্ষীর ও পদ্ম-মোহনের মৃত্যু হইলে, গঙ্গাবিষ্ণু নামে বুলাকীদাসের একজন আত্মীয় ও বুলাকী-দাসের বিধবা পত্নী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মোহনপ্রসাদ তাহাদেরও আম-মোক্তার রূপে কার্য্য করিতে থাকে।

হেস্‌টিংস মোহনপ্রসাদের সহিত যোগ দিয়া, নন্দকমারের নামে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিলেন যে, নন্দকুমার বুলাকীদাসের নামে অঙ্গীকার-পত্র জাল করিয়াছেন এবং মিথ্যা করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মোকদ্দমায় সরকারই বাদী হইতেন, এবং তৎকালে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন অনুসারে তাহাতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। নন্দকুমারের সহিত বুলাকীদাসের হিসাবপত্র লইয়া দেওয়ানী আদালতে গঙ্গাবিষ্ণু এক মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল; মোহনপ্রসাদ তাহার তদ্বির করিতেছিল। সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে না হইতে, হেস্‌টিংস-এর পরামর্শে এই ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থাপিত করা হইল।

নন্দকমারের নামে সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, জজেরা তাহাকে জেলে পাঠাইলেন। নন্দকুমার নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জেলে থাকিলে তাহার স্নানাহ্নিক ও আহারাদির অসুবিধা এবং জাতি-নাশ হইবে বলিয়া তাঁহার পক্ষীয়েরা আবেদন করিলে, এমন কি কাউন্সিলের সভ্যেরাও তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে, জজেরা সে-কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা কোন কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া জানাইলেন যে, ইহাতে নন্দকুমারের জাতি নষ্ট হইবে না। কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা, বাণেশ্বর শর্ম্মা, কৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা ও গৌরীকান্ত শর্ম্মা এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করেন। সুতরাং নন্দকুমারকে কারা-যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইল; তিনি জামিনে নিষ্কৃতি পাইলেন না।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার আরম্ভ হয়। জজেরা জুরীদিগকে চার্জ বুঝাইয়া দিবার পর, জুরীরা প্রায় এক ঘণ্টা পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। ইংলণ্ডের তৎকাল-প্রচলিত আইন অনুসারে ১৬ই জুন মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হইল।

প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে, কারাগারের একটি দ্বিতল গৃহ তাঁহার আবাসস্থান-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সে গৃহে আর কেহ থাকিত না; তথায় মহারাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথনে ও শাস্ত্রালাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর নন্দকুমার যে কয় দিবস জীবিত ছিলেন, সেই কয় দিবস তিনি যে কি দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধিমান্-মাত্রেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু তিনি সে ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। ক্রমে ক্রমে তিনি হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং নির্ভীকচিত্তে সেই অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি যে নিরপরাধ তাহা উল্লেখ করিয়া নন্দকুমার এই সময়ে ফ্রান্সিস ও ক্লেভারিংকে একখানি পত্র লেখেন। মহারাজকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ক্রমে মহারাজের মৃত্যু-দিন অগ্রসর হইয়া আসিল। তাঁহার জীবনের শেষ দুই দিনের চিত্র অতীব শোকাবহ; তাহা হইতে মহারাজ নন্দকুমারের স্থির-চিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার তদানীন্তন শেরিফ ম্যাক্রেবী এই দুই দিনের ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন; তিনি একজন সাধুপ্রকৃতি ইংরেজ ছিলেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন, "৪ঠা আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া, এরূপভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কল্য যে তাঁহাকে এ জগৎ হইতে চির-বিদায় লইতে হইবে, তাহা কি তিনি অবগত নহেন? আমি অবশেষে দ্বিভাষীর দ্বারা তাঁহাকে অবগত করাই যে, আমি অদ্য তাঁহাকে শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। আগামী কল্য সেই শোচনীয় ব্যাপারে, যেরূপ হইলে মহারাজের সুবিধা হয়, আমার কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে সেরূপ সমস্তই করিতে হইবে। তাঁহার যে সমস্ত অন্তিম বাসনা আছে,

তাহা পূর্ণ করিতে আমি চেষ্টা পাইব। তাঁহার শিবিকা ও বাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার গৃহ-সম্মুখে অপেক্ষা করিবে এবং তাঁহার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তাঁহাদিগকেও রক্ষা করিতে আমি যত্ন পাইব। মহারাজ উত্তর দিলেন যে, আমার সাক্ষাতের জন্য তিনি আপ্যায়িত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। পরে তিনি কপালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তিনি ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিসকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া, রাজা গুরুদাসের তত্ত্বাবধানের জন্য ও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময়ে তাঁহার শান্তভাব অতীব বিস্ময়জনক। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহার কথায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা চাপল্যভাব ছিল না। আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, কিছু পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণের নিকট হইতে চির-বিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তার নিকটে আমরা কিছুই নহি মনে করিয়া আমি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। নীচে আসিলে জেল-রক্ষক আমাকে বলিল যে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন বিদায় গ্রহণ করিলে, তিনি নিজ-হিসাব পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও মন্তব্যাদি লিখিয়াছিলেন।

"পরদিন প্রাতঃকালে জেলে উপস্থিত হইয়া দেখি, অনাথ-দরিদ্রগণের কাতর-রোদন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহারা মহারাজকে শেষ দর্শন করিতে আসিয়াছে। মহারাজ কারাধ্যক্ষের আবাসস্থানের একটি কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলে, আমিও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। মহারাজ প্রসন্নচিত্তে তিন জন ব্রাহ্মণকে তাঁহার মৃতদেহ-বহনের জন্য ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। আমি আমার ঘড়ি দেখিয়া মহারাজকে বলিলাম যে, এখনও সময় হয় নাই। তিনি আবার আমাকে গুরুদাসের, এবং ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিসের কথা বলিয়া, একমনে ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে তিনি উঠিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি যেন রাজা গুরুদাসই লইয়া যান, জেলখানার ভৃত্যদিগকে সেইরূপ আদেশ দিয়া, পাল্কীতে আরোহণ-পূর্ব্বক বধ্যভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা গিয়া দেখিলাম, সেই সুপ্রশস্ত ময়দান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজ

তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ তিনটির জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত তাঁহার কোন গুপ্ত কথা থাকিতে পারে মনে করিয়া, আমি লোকজন সরাইয়া দিতে চাহিলাম। মহারাজ আমাকে নিষেধ করিয়া, তাঁহার পরিবারবর্গ ও গুরুদাসের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। সেই তিন জন ব্রাহ্মণের দ্বারা মৃতদেহ বহন করাইবার জন্য মহারাজ বারংবার আমাকে অনুরোধ করেন এবং আর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া যান। তিনি জনতার জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের কথা বলিলে, তিনি বলেন যে, তাঁহার অনেক বন্ধু আছেন, এ স্থানে সকলের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পরে তিনি একজনের নাম করিয়াছিলেন; অবশেষে তাহাকেও উপস্থিত হইতে নিষেধ করেন। প্রশান্তচিত্তে পুনর্ব্বার তিনি আমাকে ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিসের কথা স্মরণ করিতে বলেন। তাহার পর তিনি পাল্কীতে ঠেস দিয়া জপ করিতে থাকেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, গোলমালে আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব না; অতএব সময় হইলে, তিনি যেন কোনরূপ ইঙ্গিত করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি হস্ত-দ্বারাই সঙ্কেত করিবেন। কিন্তু তখন তাঁহার হস্তদ্বয় বদ্ধ থাকিবে, এ-কথা মনে করাইয়া দিলে, তিনি পা নাড়িয়া সঙ্কেত করিবেন বলিয়া জানাইলেন।

"সময় উপস্থিত হইলে, আমি বধমঞ্চের নিকটে তাঁহার পাল্কী লইয়া যাইতে বলিলাম; তিনি নিষেধ করিয়া পদব্রজেই অগ্রসর হইলেন। মঞ্চের সোপানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার হস্তদ্বয় একখানি রুমাল দিয়া আবদ্ধ করা হইল। পরে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক হইলে, তিনি আমাদিগকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। আমি একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীকে ঐ কার্য্য করিতে আদেশ করিলাম, কিন্তু মহারাজ তাঁহার ভৃত্যকেই তাহা করিতে বলিলেন। ভৃত্যটি তখন তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল। মহারাজ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বধমঞ্চোপরি উঠিলেন। আমি তাঁহার প্রশান্ত বদনে কোনরূপ ভাব-বিকৃতি দেখিলাম না। পরে আমি নিজে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বীয় শিবিকা-মধ্যে পলায়ন করিলাম। শিবিকায় বসিতে বসিতে আমি মঞ্চাপসারণের শব্দ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম,

মহারাজের হস্তদ্বয় যেরূপ ভাবে প্রথমে বদ্ধ ছিল, সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত আছে এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন নাই। ফলতঃ এই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজ নন্দকুমার যেরূপ শান্তভাব ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, এরূপ স্থিরচিত্ততার দৃষ্টান্ত আমি কখনও শুনি নাই বা পড়ি নাই। অবশেষে সেই ব্রাহ্মণত্রয় তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যায়।"

এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মর্ম্মস্পর্শী কাতরধ্বনি উঠিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। অনেকে সেই দৃশ্য দেখিতে অশক্ত হইয়া পলায়ন করিল; কেহ কেহ বসন-দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল, এবং কেহ কেহ এই পাপ-দৃশ্য দেখিবার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর জলে নিপতিত হইল। সমস্ত কলিকাতায় মহা-আন্দোলন পড়িয়া গেল; অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বালি প্রভৃতি স্থানে আবাস স্থাপন করিল। বঙ্গবাসি-মাত্রেই মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডে মর্ম্মাহত হইয়াছিল; ঢাকার লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা গভীর বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল। পরে ইংলণ্ডে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের জন্য হেস্‌টিংসকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

কাটরার মস্‌জিদ

জাহান্‌কোশা তোপ

নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হয়। পূর্ব্বে ইহাকে মুখ্‌সূসাবাদ বা মুখ্‌সুদাবাদ বলিত। মুখ্‌সুদাবাদ একটি সামান্য নগর মাত্র ছিল; মুর্শিদকুলী খাঁ এইস্থানে রাজধানীর ও রাজকার্য্যের উপযোগী অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করান। ক্রমশঃ কেল্লা, দরবার-গৃহ এবং অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; কেবল তাঁহার স্থাপিত এক বিরাট্ মস্‌জিদ অদ্যাপি তাঁহার নাম প্রচার করিতেছে।

মুর্শিদাবাদের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে এই বৃহৎ মস্‌জিদ অবস্থিত। মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত দেখিয়া, এবং ক্রমশঃই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় সমাধি-ভবন নির্ম্মাণের আদেশ দেন। তথায় একটি মস্‌জিদ ও কাটরা (গঞ্জ বা বাজার) স্থাপিত করিবার কথাও থাকে। উক্ত কাটরা হইতে স্থানটিরও নাম কাটরা হইয়াছে। মোরাদ ফরাশ নামে একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সেই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। এক বৎসরের মধ্যে সমাধি-ভবনটি নির্ম্মিত হয়। কাটরাটি স্থাপন করিয়া, তাহার আয় হইতে সমাধি-সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৭২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে মস্‌জিদ-নির্ম্মাণ শেষ হয়। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কা'বা মস্‌জিদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মস্‌জিদের সঙ্গে মিনার, চৌবাচচা, ইন্দারা প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। মস্‌জিদ-নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর মুর্শিদকুলী খাঁ এক বৎসরের কিছু অধিক কাল জীবিত ছিলেন। তাহার আদেশে মস্‌জিদের প্রবেশ-দ্বারের সোপানাবলীর নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হয় এবং সেই প্রকোষ্ঠেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। উপাসনার নিমিত্ত সমাগত সাধুদিগের পদধূলি পরলোকে তাঁহার কল্যাণ সম্পাদন করিবে, তাঁহার এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল; সেইজন্য তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ যেরূপ আনুষ্ঠানিক মুসল্‌মান ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এরূপ আচরণ বিচিত্র নহে।

কাটরার মস্‌জিদ এক্ষণে ভগ্নদশায় উপস্থিত; তথাপি ইহার বিরাট্ গৌরবের নিদর্শন এখনও অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। মস্‌জিদের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সদর-রাস্তা; রাস্তা হইতে মস্‌জিদের দক্ষিণ-পার্শ্বে একটি পথ দিয়া মস্‌জিদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। মস্‌জিদ পূর্ব্ব-মুখে অবস্থিত। প্রবেশ-দ্বারে উঠিতে হইলে, চৌদ্দটি বৃহৎ সোপান অতিক্রম করিতে হয়। এই মস্‌জিদ-মধ্যে প্রবেশ করিতে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কপোত ও মধুমক্ষিকাগণ আপনাদিগের উপযুক্ত আবাসস্থান বিবেচনায় মস্‌জিদটিকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। চত্বরের চারিপার্শ্বে মোসাফের (অর্থাৎ পথিক) এবং কারী (অর্থাৎ কোরান-পাঠক)-গণের জন্য বহুসংখ্যক

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। গৃহগুলি সমস্তই খিলানের, একটিতেও কড়ি-বরগা নাই। এখনও তাহাদের ভগ্নাবশেষ নয়ন-পথে পতিত হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিশাল কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। মস্‌জিদের পশ্চাদ্ভাগের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুইটি অত্যুচ্চ অষ্ট-কোণ মিনার যেন গগন স্পর্শ করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের মিনারে যাইবার সুবিধা নাই; তাহার চারিদিক এক্ষণে ভীষণ জঙ্গলে আবৃত। দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারে উঠিতে পারা যায়। ৬৭টি সর্প-গতি সোপান অতিক্রম করিয়া মিনারের চূড়াতলে উঠিতে হয়; মধ্যে মধ্যে আলোক ও বায়ু-প্রবেশের দ্বারও আছে। মিনারটি প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ হইবে; চূড়াতল হইতে ভূমি পর্য্যন্ত অংশ প্রায় ৩০ হস্ত।

কাটরার মস্‌জিদ হইতে পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আর একটি মস্‌জিদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে; তাহাকে ফৌতী মস্‌জিদ কহে। মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সর্‌ফরাজ খাঁ উক্ত মস্‌জিদের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছিলেন। মস্‌জিদ-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত যুদ্ধার্থ গিরিয়া প্রান্তরে গমন করেন; কিন্তু তাঁহাকে আর জীবিত অবস্থায় প্রত্যাগমন কবিতে হয় নাই। মস্‌জিদটি কাটরার পঞ্চ-গুম্বজ মস্‌জিদের অনুকরণে নিৰ্ম্মিত হইতেছিল। উহার পাঁচটি গুম্বজের মধ্যে দুইটি আজিও বর্ত্তমান আছে। সেই অসম্পূর্ণ মস্‌জিদও ভগ্নদশায় পতিত; বিশেষতঃ এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত হইয়া উহা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুর আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

কাটবার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দুইটি অশ্বত্থতরুর (অথবা একটি অশ্বত্থতরুর দুইটি সংলগ্ন কাণ্ডের) মধ্যস্থলে এক বিশাল কামান অবস্থিতি করিতেছে। এই কামানের নাম 'জাহান্‌কোশা,' অর্থাৎ 'জগজ্জয়ী'। এই স্থানে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কামান প্রভৃতি রক্ষিত হইত; সেই জন্য এই স্থানটিকে আজিও সাধারণে তোপখানা কহিয়া থাকে। এই তোপখানার উত্তর দিক দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী সর্প-গতিতে আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। জাহান্‌কোশা অনেকদিন পর্য্যন্ত ধরণী-বক্ষে স্বীয় বিশাল বপু বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; ইহার পার্শ্বে অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মিয়া জাহান্‌কোশাকে ভূতল হইতে কতকটা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে।

কামানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ হাত হইবে, বেড় ৩ হাতের অধিক, মুখের বেড় ১ হাতের উপর। অগ্নিসংযোগ-ছিদ্রের ব্যাস ১।।০ ইঞ্চি হইবে। কামানের গাত্রে ফারসী ভাষায় খোদিত ৯ খানি পিত্তল-ফলক আছে; ৩ খানি অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড-মধ্যে প্রবিষ্ট, অবশিষ্ট কয়েকখানিও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিত্তল-ফলকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ইস্‌লাম খাঁর গুণ-বর্ণনা ও কামান-নির্ম্মাণের তারিখ প্রভৃতি খোদিত আছে। এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহান্‌কোশা কামান সম্রাট্ শাহ্-জাহানের রাজত্বকালে ও ইস্‌লাম খাঁর বাঙ্গলা-শাসনের সময়ে, জাহাঙ্গীর-নগরে দারোগা শের মোহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার-কর্ত্তৃক হিজরী ১০৪৭ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহা ওজনে ২১২ মণ। এই কামান দাগিতে ২৮ সের বারুদ লাগিত।

ঢাকায় ইহা অপেক্ষা বৃহৎ একটি তোপ ছিল; তাহা এক্ষণে নদী-গর্ভে পতিত। বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত 'দল-মাদল' (অর্থাৎ দল-মর্দ্দন) কামান এখনও বিদ্যমান। পূর্ব্বে আমাদের দেশে শিল্পের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কিরীটেশ্বরী

'বঙ্গাধিকারি'গণ

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া যে স্থলে প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই অপর পারে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, ডাহাপাড়া নামক একটি পল্লীগ্রাম আছে। এককালে এই ডাহাপাড়া মুর্শিদাবাদ-রাজধানীর অন্তর্গত এবং বহুসংখ্যক অট্টালিকায় বিভূষিত ছিল। ডাহাপাড়া হইতে প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দৃষ্ট হয়, তাহার নাম কিরীটকণা। কিরীটকণা এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। স্থানটি অরণ্যময় হইয়াও যেন শান্তির নিকেতন; মুর্শিদাবাদের

মধ্যে এরূপ বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থান অতি বিরল। এই স্থানে কতিপয় প্রাচীন মন্দির জীর্ণাবস্থায় আছে; সেগুলি মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগাইয়া দেয়। কিরীটকণা মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন স্থান। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, দক্ষ-দুহিতা সতীদেবীর কিরীটের একটি কণা এই স্থানে পতিত হয়; তজ্জন্য ইহা উপপীঠ-মধ্যে গণ্য। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এতদঞ্চলে কিরীটেশ্বরী নামে কীর্ত্তিতা। কিরীটেশ্বরী যেন সমস্ত মুর্শিদাবাদেরই অধিষ্ঠাত্রী-স্বরূপা ছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল বৈষ্ণব এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু যৎকালে বঙ্গাধিকারিগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ-ত্রয়ের প্রধান কানুনগো-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীর মহিমা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং কিরীটকণার প্রাচীন মন্দির সংস্কৃত ও বর্ত্তমান প্রধান মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হয়।

'বঙ্গাধিকারি'গণের মতে, তাঁহাদের আদিপুরুষ ভগবান্ রায় স্বীয় কার্য্য-দক্ষতায় মোগলকেশরী দিল্লীশ্বর আকবর শাহ্‌কে পরিতুষ্ট করিয়া, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার কানুনগো-পদ ও 'বঙ্গাধিকারী মহাশয়' উপাধি লাভ করেন; কিন্তু অনুমান হয় যে, ভগবান্ রায় শাহ্-শুজার সময়েই উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ রায় কানুনগো হন। তিনি সম্রাটের নিকট হইতে বিস্তর লাখেরাজ ও দেবত্রা সম্পত্তি পারিতোষিক-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বঙ্গবিনোদের পর ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণ স্বীয় পিতার পদ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরি-নারায়ণের পর তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ উক্ত কানুনগো-পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় অবস্থিতি করেন; সেই সময়ে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। দর্পনারায়ণের কার্য্যকালের শেষভাগে, যৎকালে সম্রাট্ ঔরঙ্গ্‌জেবের পৌত্র নবাব আজীমু-শ্-শান বাঙ্গলার মস্‌নদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে মর্শিদকুলী খাঁ ঔরঙ্গজেবের আদেশক্রমে বাঙ্গলার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। নবাব আজীমু-শ্-শানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, মুর্শিদকুলী ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুখ্‌সুদাবাদ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে

দেওয়ানী-সম্পর্কীয় যাবতীয় কর্ম্মচারী তথায় আসিতে বাধ্য হন; অগত্যা দপনারায়ণকেও আসিতে হয়। এই সময়ে জগৎশেঠদিগের আদি-পুরুষ শেঠ মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ, জগৎশেঠেরা বঙ্গাধিকারিগণ মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও সম্মাননীয় বংশ। উক্ত তিন বংশের বাঙ্গলার শাসন ও রাজস্ব-সম্বন্ধে একাধিপত্য ছিল। দপনারায়ণ মুর্শিদাবাদে আসিয়া ডাহাপাড়ায় স্বীয় আবাস-ভবন নির্ম্মাণ করান। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণ কিরীটেশ্বরীর নিকটে অবস্থিতি করায়, তাঁহারা দেবীর গৌরব-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকেন, এবং মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী ছিল বলিয়া, কিরীটেশ্বরীর প্রতি বাঙ্গলার সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়।

দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর ‘গুপ্ত-মঠ’ নামে প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার এবং তথায় শিব-মন্দির ও ভৈরব-মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহার নিকটে আরও দুই একটি মন্দির জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত মন্দিরের নিকটে দর্পনারায়ণ ‘কালীসাগর’ নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। পুষ্করিণীটি যেমন বৃহৎ, তেমনি গভীর ছিল। এক্ষণে উহা শৈবাল ও পঙ্কে পরিপূর্ণ, উহার জলও অপেয়। মন্দিরের নিকটে উহা কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত সোপানাবলী-দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল; এক্ষণে তাহাদেরও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরী-মেলার প্রবর্ত্তন করেন। এই মেলা উপলক্ষ্যে নানা স্থান হইতে যাত্রীর সমাগম হইত। দোকান-পসারীতে পরিপূর্ণ হইয়া, কিরীটকণা গৌরবময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিত। অদ্যাপি পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে উক্ত মেলা বসিয়া থাকে; কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রাণহীন। বর্ষাকালে কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হওয়ায়, লোকের গমনাগমনের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিত। সেই অসুবিধা নিবারণের জন্য দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ পথের সংস্কার ও একটি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবনারায়ণ মন্দিরাদিরও সংস্কার করাইয়াছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলার রাজত্ব-কাল হইতে কোম্পানীর সময় পর্য্যন্ত শিবনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কানুনগো ছিলেন; তিনি সাধ্যানুসারে কিরীটেশ্বরীর সেবা করিতেন। ভবানীর প্রিয়পুত্র নাটোর-রাজ রামকৃষ্ণ যখন রাজকার্য্যোপলক্ষ্যে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতেন,

তখন তিনি সাধনার জন্য কিরীটেশ্বরীতে গমন করিতেন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হওয়ায়, রামকৃষ্ণ মন্দিরাদির সংস্কার করাইয়া দেন। তাহার পর ব্রিটিশ-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন মুসল্‌মান-রাজলক্ষ্মীর কিরীট শিথিল হইয়া পড়ে, সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীর কিরীটও শিথিল হইতে আরম্ভ হয়।

বড় নগর

রাণী ভবানী

বঙ্গের অসংখ্য নর-নারী যাঁহাকে দেবতা-বোধে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে, সেই দীন-জননী, সাক্ষাৎ-অন্নপূর্ণা-রূপিণী রাণী ভবানীর সহিত মুর্শিদাবাদের সম্বন্ধ নিতান্ত অল্প ছিল না। বঙ্গদেশ হইতে সুদূর কাশীধাম পর্য্যন্ত স্থান যাঁহার অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, মুর্শিদাবাদও তাঁহার সেই পুণ্যচ্ছায়ায় অদ্যাপি স্নিগ্ধ হইয়া আছে। আজিও মুর্শিদাবাদের বড়নগর তাঁহার অতুলনীয় দেব-ভক্তির কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছে। বড়নগর তাঁহার অতীব প্রিয় বাসস্থান ছিল; তথায় তিনি জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বড়নগরের ভাগীরথী-তীরেই তাঁহার পুণ্যময় জীবন-দীপ চির-নির্ব্বাপিত হয়। তাই বড়নগর হিন্দুর পক্ষে বড় আদরের সামগ্রী, একরূপ তীর্থস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়নগর মুর্শিদাবাদের বারাণসী। ইহার চারিদিক্ই দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ। যদিও বড়নগর এক্ষণে ঘোর অরণ্যে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি দুই চারি পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই এ-স্থলে একটি না একটি দেবমন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। মুর্শিদাবাদের অন্য কোন স্থানে এত দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না।

বড়নগর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এবং বর্ত্তমান আজীমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা সুবিস্তৃত

রাজশাহী জমীদারীর রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দিন পর্য্যন্ত ইহা মুর্শিদাবাদের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে সমস্ত প্রধান প্রধান আড়ঙ্গ ছিল, বড়নগর তাহাদের অন্যতম। এই সমস্ত আড়ঙ্গে ইউরোপীয়গণের দালাল গোমস্তারা প্রতি-নিয়তই গতায়াত করিত। মুর্শিদাবাদের খাগড়া প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ কাংস্যবণিকের বাসস্থান পূর্ব্বে বড়নগরেই ছিল। বড়নগরের পিত্তল-কাঁসার দ্রব্য অতীব উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বড়নগরের ঘড়ার কথা বঙ্গবাসিমাত্রেই বিশেষ করিয়া জানিত। এখানে এত অধিক কাংস্যবণিকের বাস ছিল যে, রজনীর শেষভাগে তাহাদিগের বাসন-নির্ম্মাণের শব্দে সমস্ত গ্রামের লোকের নিদ্রা-ভঙ্গ হইত। এজন্য রাজা বিশ্বনাথের পত্নী রাণী জয়মণি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর নহবৎ রাখিবার প্রয়োজন হইবে না।

রাজা উদয়নারায়ণের পতনের পর রাজশাহী জমীদারী নাটোর-রাজবংশের করায়ত্ত হইলে, বড়নগর তাঁহাদের মুর্শিদাবাদের বাসস্থান-রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজধানী মুর্শিদাবাদে তৎকালে বঙ্গের প্রায় সমস্ত জমীদারেরই এক একটি বাসস্থান ছিল। বিশেষতঃ নাটোর-রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে নায়েব-কানুনগোর কার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদেই থাকিতে হইত। রঘুনন্দন প্রথমে পুঁটিয়া-রাজসংসারে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন; পরে পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে স্বীয় উকীল নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় নবাব-দরবারে পাঠাইয়া দেন। তথা হইতে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। রঘুনন্দন স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় ক্রমে নায়েব-কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন, এবং মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার অনুগ্রহে অনেক জমীদারী লাভ করেন। এই সমস্ত জমীদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে গৃহীত হইয়াছিল। রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ (কালুকোঙার) এক দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রামকান্ত। কালিকাপ্রসাদ অল্প-বয়সে পরলোকগত হইলে, রামকান্ত নাটোরের সমস্ত জমীদারী ও ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হন। এই রামকান্তের পত্নীই ভারত-বিখ্যাতা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী।

রামকান্ত পরলোকগত হইলে, রাণী ভবানী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরা-ধিকারিণী হইয়া বাঙ্গলার জমীদারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

তাঁহার সমস্ত জমীদারী হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা কর আদায় হইত; তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে রাজস্ব দেওয়া হইত, অবশিষ্ট প্রায় সমস্তই পুণ্য-কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তৎকালে বঙ্গের জমীদারদিগের মধ্যে নাটোর-বংশের আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

৩২ বৎসর বয়সে রাণী ভবানীর বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়। তাঁহার তারা-নাম্নী একটি-মাত্র কন্যা ছিল। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ী নামে জনৈক ব্রাহ্মণ-তনয়ের সহিত তিনি তারার বিবাহ প্রদান করেন; কিন্তু তারাকে চির-ব্রহ্মচারিণী রাখিয়া ও রাণী ভবানীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া রঘুনাথ অল্প-বয়সে পরলোকগত হন। অগত্যা রাণী ভবানী একটি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন; এই দত্তক-পুত্রই বঙ্গের সাধক-চূড়ামণি রাজ-যোগী রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাণী ভবানী তাঁহার হস্তে বিষয়-ভার সমর্পণ করিয়া বড়নগরে ভাগীরথী-তীরে আসিয়া বাস করেন এবং তাহা দেবমন্দিরে ভূষিত করিয়া বারাণসী-তুল্য পবিত্র করিয়া তুলেন। ধর্ম্মপ্রাণা মাতার সঙ্গে তাঁহার উপযুক্তা কন্যা তারাও গঙ্গাবাসিনী হন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বড়নগরে আসিয়া বাস করিতেন। রামকৃষ্ণ প্রতিদিন বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরীতে সাধনার্থ গমন করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রাণী ভবানীর জীবিতাবস্থাতেই রামকৃষ্ণের জীবন-লীলার অবসান হয়। রামকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বনাথের প্রথমা পত্নী রাণী জয়মণি নাটোর হইতে বড়নগরে আসিয়া বাস করেন। কোন বৈষ্ণব গোস্বামীর পরামর্শে বিশ্বনাথ ইষ্ট-মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ রাণী জয়মণিকে ইষ্ট-মন্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায়, তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া রাণী ভবানীর নিকটে চলিয়া আসেন। তদবধি তিনি বড়নগরেই বাস করিতেন। রাণী ভবানী তাঁহার সমস্ত দেবত্রা সম্পত্তি জয়মণিকে দানপত্র-দ্বারা অর্পণ করিয়া যান।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক দেবসেবায় ও দীন-প্রতিপালনে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া, রাণী ভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে বড়নগরে ভাগীরথী-তীরে বিশ্ব-জননী ভবানীর সহিত চির-সম্মিলিত হন।

রাণী ভবানী প্রতিদিন রাত্রি চারি-দণ্ড থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া, মালা-জপ করিতে বসিতেন; রাত্রি অর্দ্ধ-দণ্ড থাকিতে জপ শেষ হইলে, তিনি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে পুষ্প-চয়ন করিতেন। যেদিন অন্ধকার থাকিত, সেদিন ভৃত্যেরা অগ্র-পশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্প-চয়নের পর প্রত্যুষে গঙ্গা-স্নান করিয়া, বেলা দুই-দণ্ড পর্য্যন্ত ঘাটে বসিয়া জপ, গঙ্গা-পূজা ও শিব-পূজা করা হইত। তাহার পর তিনি প্রত্যেক দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গৃহে আগমন-পূর্ব্বক পুরাণ-শ্রবণ, শিব-পূজা ও ইষ্ট-পূজা করিতেন। বেলা দুই-প্রহর পর্য্যন্ত এই সমস্ত কার্য্যে অতিবাহিত হইত। তাহার পর তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন; অবশেষে পরিবারস্থ ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া আড়াই-প্রহর বেলার পর স্বয়ং হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে কুশাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া তিনি কর্ম্মচারিগণকে বিষয়কর্ম্মের আজ্ঞা দিতেন; তাহারা সেই সমস্ত আদেশ লিখিয়া লইত। তৃতীয়-প্রহরের পর তিনি পুনর্ব্বার পুরাণ-শ্রবণ করিতেন। দুই-দণ্ড বেলা থাকিতে পুরাণ-শ্রবণ শেষ হইত। সেই সময়ে কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী লিখনাদি প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষর করাইতে আসিত। রাণী এই লিখনাদির মর্ম শুনিয়া, তাহাতে মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিতেন। সায়ংকালে পুনর্ব্বার গঙ্গা-দর্শন করিয়া ও গঙ্গাতে ঘৃত-প্রদীপ দিয়া বাস-ভবনে আসিয়া রাত্রি চারি-দণ্ড পর্য্যন্ত তিনি মালা-জপ করিতেন; তাহার পর জল-গ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে গিয়া, বিষয়-সংক্রান্ত কার্য্যের নির্দ্দেশ দিতেন। রাত্রি এক-প্রহরের সময়ে তিনি প্রজাদিগের আবেদন শুনিয়া বিচার করিতেন; অবশেষে পৌরজন কে কি-ভাবে আছে তাহার সন্ধান লইয়া, রাত্রি দেড়-প্রহরের সময়ে তিনি শয়ন করিতে যাইতেন।

রাণী ভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য দেবালয়ের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই সমস্ত অর্থ দেবকার্য্যে ব্যয়িত হইত; তিনি তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার নিজের ও তাঁহার সহচরী বিধবামণ্ডলীর জন্য অবশেষে তাঁহাকে সরকারের বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমে তিনি মাসিক ৮,০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন; পরে উহা কমিতে কমিতে ১,০০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

রাণী ভবানীর স্থাপিত ভবানীশ্বর-মন্দির বড়নগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। ইহার ন্যায় গগনস্পর্শী মন্দির বড়নগরে আর দ্বিতীয় নাই এবং বাঙ্গলার অন্য কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। ভবানীশ্বর-মন্দির ভাগীরথী-তীর হইতে কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। এই বৃহৎ মন্দিরের চতুপার্শ্বে বারাণ্ডা; বারাণ্ডায় আটটি প্রবেশ-পথ আছে। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়। মন্দিরটি এক্ষণে অসংস্কৃত অবস্থায় বর্ত্তমান। ভবানীশ্বর-মন্দিরের পশ্চিমে রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারার স্থাপিত গোপাল-মন্দির। এই মন্দির-মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মনোহর গোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত। গোপাল-মন্দিরের পশ্চাতে, অর্থাৎ উত্তর দিকে, একটি শুষ্ক বিল্বতলায় রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। বেদীর চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রামকৃষ্ণ যে শবে বসিয়া সাধন করিতেন, একটি খর্জ্জূর-বৃক্ষের তলায় তাহা প্রোথিত আছে বলিয়া বড়নগরের লোকেরা গল্প করিয়া থাকে। তাহারই নিকটে গোপাল-পুষ্করিণী। গোপাল-মন্দিরের দক্ষিণে রাজরাজেশ্বরী-ভবন। ইহার তিন দিকের গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই বাটীটি কিরূপ সমারোহময় ছিল, ইহার ভগ্নাবস্থা হইতেই তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল উত্তর দিকে রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরটি মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। এই মন্দিরের মধ্যে এক বিশাল বেদীর উপরে রাণী ভবানী-কর্ত্তৃক স্থাপিত দশভুজা সিংহবাহিনী রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি বিরাজিত।

রাজরাজেশ্বরী-ভবনের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে মদনগোপালের মন্দির। মদন-গোপালের মন্দিরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে 'চারি বাঙ্গলা'র মন্দির। মুর্শিদাবাদের মধ্যে ইহা একটি দর্শনীয় বস্তু। চারিদিকে চারিটি বাঙ্গলা বা মন্দির অবস্থিত। প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করিয়া শিব-মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরও রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত। এই চারিটি বাঙ্গলার শিল্প-কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়। বড়নগর-সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই ইহার শিল্প-কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন। ইহার প্রত্যেকটি ইষ্টক কারুকার্য্যময়; নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি-ক্ষোদিত ছাঁচে মৃত্তিকাবিন্যাস করিয়া এই সকল ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল ইষ্টকে কোন স্থানে দশাবতার, কোন স্থানে দশমহাবিদ্যা, কোথাও রাম-রাবণের যুদ্ধ, কোথাও শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ অঙ্কিত আছে; এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ, অসংখ্য

শিবমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল মন্দির দেখিলে, পুরাতন শিল্পের ও তৎকালীন লোকদিগের স্বধর্ম্ম-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বড়নগরে আরও অনেক দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মন্দিরের চারি পাশে রাজবাটী ছিল। রাজবাটীর দক্ষিণ দিকের পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিখার সহিত একটি ক্ষুদ্র খালের সংযোগ ছিল বলিয়া কথিত আছে। এই পরিখা ও সেই খাল দিয়া তরণী-আরোহণে রাজা রামকৃষ্ণ সাধনার্থ প্রতি-রাত্রি কিরীটেশ্বরীতে গমন করিতেন। ভবানীশ্বর-মন্দির ও গোপাল-মন্দিরের উত্তর দিকে রাজবাটীর চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি পূর্ব্ব-দ্বারী ঘরের নীচের তলায় রাণী ভবানী বাস করিতেন। সেই পবিত্র গৃহটি আজিও রাজসংসারের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে।

রোশ্‌নীবাগ

ফর্হাবাগ (ফর্হৎবাগ)

মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব-প্রাসাদের সম্মুখে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি সুন্দর ছায়াময় ও শান্তিময় উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই উদ্যানটির নাম রোশ্‌নীবাগ। রোশ্‌নীবাগ ডাহাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। উদ্যানটি আকারে বৃহৎ না হইলেও ইহার রমণীয়তা সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়। পূর্ব্বে এই উদ্যানের সম্মুখে নবাবদিগের আলোকোৎসব ('ব্যারা' উৎসব) হইত বলিয়া, সাধারণতঃ এই স্থানকে রোশ্‌নীবাগ বলা হয়।

এই রমণীয় উদ্যানের ছায়াতলে মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব শুজাউদ্দীন সমাহিত আছেন। শুজাউদ্দীন নবাব মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জামাতা। শুজা পূর্ব্বে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার উড়িষ্যায় অবস্থান-কালে আলীবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হাজী আহমদ তাঁহার অধীনতায় কার্য্যে নিযুক্ত হন; পরে তাঁহার নিজামতীর সময়ে তাঁহাদিগের আরও উন্নতি হয়।

শুজাউদ্দীনের তুল্য ন্যায়পরায়ণ নবাব অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার পরোপকারিতা, অমায়িক ব্যবহার ও ন্যায়ানুমোদিত শাসনপ্রিয়তা মুর্শিদাবাদের অপর কোনও নবাবে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সম-ভাবে প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হন। মুর্শিদকুলী খাঁ যে সমস্ত জমীদারকে বন্দী-অবস্থায় রাখিয়া অশেষ কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন, শুজাউদ্দীন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার শাসনে হিন্দু ও মুসলমান প্রজা সকলেই প্রীত ছিল।

মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে উপবেশন করিয়া শুজা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ের নির্ম্মিত ইমারৎগুলি শুজার বিবেচনায় তাদৃশ মনোরঞ্জক না হওয়ায়, তিনি তৎপরিবর্ত্তে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার নির্ম্মাণ-ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি একটি উদ্যান; এই উদ্যানটির নাম 'ফর্হৎবাগ' বা 'ফর্হাবাগ,' অর্থাৎ 'সুখ-কানন'। ফর্হাবাগ ডাহাপাড়াতে রোশ্‌নীবাগ হইতে কিছু উত্তরে অবস্থিত। নবাব শুজাউদ্দীন নিজে এই উদ্যানটিকে বিবিধ প্রকারে সুশোভিত করিয়াছিলেন। ঐ উদ্যানের মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রমোদ-অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। উহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইত। স্থানে স্থানে ফোয়ারা, চৌবাচ্চা ও নহর জল-ভরে টল্-টল্ করিয়া উদ্যানটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ উদ্যানে পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার চারিদিক্ সোপান-দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া লোকের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইত। মুসলমান লেখকগণ বলেন যে, ইহার রমণীয়তার নিকটে কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ উদ্যানসকলও লজ্জা পাইত। স্বীয় অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের মনোরঞ্জনের জন্য নবাব মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের সহিত এই সুখ-কাননে সমবেত হইতেন। এইরূপ আমোদপ্রমোদ ব্যতীত তিনি একটি প্রশংসনীয় আমোদও উপভোগ করিতেন। শুজা প্রতিবৎসর যাবতীয় বিদ্বান্ ও গুণী-জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাদরের সহিত ফর্হাবাগে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন। নবাব শুজাউদ্দীন বিলাসী হইলেও যে গুণের মর্য্যাদা করিতেন, ইহা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুজাউদ্দীনের সাধের ফর্হাবাগ এক্ষণে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। সে সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর বৃক্ষরাজির চিহ্নমাত্রও নাই। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী শুষ্ক অবস্থায় রহিয়াছে। নহর ও চৌবাচচার কোন নিদর্শন দেখা যায় না; মধ্যে মধ্যে অট্টালিকার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ফর্হাবাগের মধ্যে দুই এক ঘর কৃষক বাস করিতেছে; তাহারা উদ্যানের ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে সর্ষপাদি শস্য বপন করিয়া থাকে। স্থানটিকে আজিও ফর্হাবাগ বলে; নতুবা এখন লোকে শুজাউদ্দীনের প্রমোদ-কাননের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিত না।

শুজাউদ্দীন রোশ্‌নীবাগের ছায়াতলে বিশ্রাম-লাভ করিতেছেন। রিয়াজ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহাকে কেল্লার সম্মুখে ডাহাপাড়ার মস্‌জিদ-ভবনে সমাহিত করা হয়। এই মস্‌জিদটি তাঁহার স্থাপিত কি না, বলা যায় না। রোশ্‌নীবাগে যে মস্‌জিদটি বিদ্যমান আছে, তাহাতে হিঃ ১১৫৬ অব্দ লিখিত আছে, এবং এই নিমিত্ত মনে হয় যে, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মোহাবৎজঙ্গ উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; শুজাউদ্দীন হইতে তাঁহার উন্নতির সূচনা হওয়ায়, সম্ভবতঃ আলীবর্দ্দী স্বীয় প্রভুর পরকালের কল্যাণোদ্দেশে তাঁহার সমাধি-স্থলে উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া থাকিবেন। রোশ্‌নীবাগের বর্ত্তমান সমাধি-ভবনের উত্তর দিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার। প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে শুজার সমাধি-গৃহ দৃষ্ট হয়। প্রায় ৩ হাত উচচ একটি বিস্তৃত ভিত্তির উপর এই সমাধি-ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন সমাধি-ভবন ধ্বংসমুখে পতিত হইলে, তাহারই ভিত্তিতে এই নূতন সমাধি-ভবন নির্ম্মিত হয়। সমাধি-ভবন হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং সমাধি-গৃহ ও প্রবেশ-দ্বারের মধ্যে একটি ত্রি-গুম্বজ-বিশিষ্ট মস্‌জিদ; এই মস্‌জিদে উপাসনাদি কার্য্য হইয়া থাকে। আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এই সমাধি-ভবন ও মস্‌জিদকে ছায়া-দ্বারা আবৃত করিয়া অতীব মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। রোশ্‌নীবাগের সমাধি-ভবনের নিম্ন দিয়া কুলুকুলু-নাদিনী ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে।

ভগবানগোলা

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভগবানগোলার গৌরব উচ্চ-সীমা অধিকার করিয়াছিল। পদ্মা, ভাগীরথী, জলঙ্গী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীর বক্ষ দিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের পণ্যদ্রব্য আসিয়া ভগবানগোলার বাজার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। নিকটে কাসিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত থাকায়, এখানে ক্রয়বিক্রয়-ব্যাপার সর্ব্বদাই চলিত। এতদ্ভিন্ন, ভগবানগোলা বাঙ্গলার একরূপ সীমান্তে অবস্থিত থাকায়, বিহার-প্রদেশের সহিত ইহার বাণিজ্য-কার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল। পদ্মার তীরবর্ত্তী বলিয়া, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের সহিতও ইহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে ইহার সৌষ্ঠব সর্ব্বোচ্চ-সীমায় উপনীত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গভূমি বারংবার মহারাষ্ট্রীয়গণ-কর্ত্তৃক উপদ্রুত হয়, এজন্য ভগবানগোলাকে বিশেষরূপে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল; নদী-তীর ব্যতীত অন্য সকল দিক্ পরিখা ও কাষ্ঠের প্রাচীর-দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। মহারাষ্ট্রীয়-আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, সময়ে সময়ে সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতিক ইহার রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত এবং সুবার বিশ্বস্ত, নিপুণ ও কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারিগণই ইহার রক্ষণ-ভার গ্রহণ করিতেন।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত ও আলীভাই-এর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ চারিবার ভগবানগোলা আক্রমণ করে; কিন্তু প্রত্যেকটি আক্রমণ প্রতিহত হয়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্ব্বার ভগবানগোলা আক্রমণ করে। এইবার তাহারা নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং বহু দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থাদি লুণ্ঠন করিয়া গৃহসকল ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া যায়। এই আক্রমণে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ভগবানগোলায় নবাবের নৌ-বাহিনী সর্ব্বদা অবস্থিতি করিত। জলপথে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতে হইলে, প্রথমে ভগবানগোলার নিকটে উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণে বহিঃশত্রুকে

বাধা-প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং ভগবানগোলা-বন্দরের সুরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদের নৌ-বহর সর্ব্বদা ভগবানগোলায় সুসজ্জিত থাকিত। সুতরাং বাঙ্গলার নৌ-বহরের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। নৌ-বাহিনীর অবস্থানের ফলে, মহারাষ্ট্রীয়গণ অনেকবার ভগবানগোলা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ভগবানগোলার বাজারে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মণ শস্য, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী হইত। উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ, রাঢ়, বিহার, সকল প্রদেশ হইতেই নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী হইত, এবং তৎসমুদয় সেখান হইতে ভারতের সর্ব্বত্র সরবরাহ হইত। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ধান্য, মুগ, কলাই, লঙ্কা, পলাণ্ডু, তূলা, রেশম, নীল ও বস্ত্রাদির আমদানীতে ভগবানগোলার বাজার সর্ব্বদাই সমারোহময় থাকিত। শত শত বিপণিতে পরিপূর্ণ হইয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আবাসভূমি-রূপে ভগবানগোলা সকলের মনে আনন্দ ও উৎসাহের ধারা ঢালিয়া দিত। তথায় দেশীয়-বিদেশীয় নানাজাতীয় ক্রেতা, বিক্রেতা, দালাল, গোমস্তার কলরব প্রতিনিয়ত আকাশপথে উত্থিত হইত। ভগবানগোলা সুবার খাস-মহলের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহার বাজার হইতে বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা কর আদায় হইত। কেবল ধান্য প্রভৃতি শস্য হইতেই বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা শুল্ক সংগৃহীত হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়। ভগবানগোলার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, ঐ সমস্ত বিবরণ প্রবাদবাক্য বলিয়া বোধ হয়।

ভগবানগোলার সহিত আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া হতভাগ্য সিরাজ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফুন্নেসার সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে ভগবানগোলায় আসিয়া উপস্থিত হন। ভগবানগোলায় প্রায়ই নবাবের নৌকার বন্দোবস্ত থাকিত। তিনি নৌকারোহণে ভগবানগোলা পরিত্যাগ করিয়া রাজমহল-অভিমুখে গমন-কালে, মালদহের নিকটে মীরজাফরের অনুচর-বর্গ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে পুনরানীত হন। যে দিন ভগবানগোলা সিরাজকে চির-বিদায় দিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহারও সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ করে।

বর্ত্তমান সময়ে ভগবানগোলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার পূর্ব্ব-বাণিজ্য-গৌরবের চিহ্নমাত্রও নাই। পদ্মা যেন মনোদুঃখে ইহাকে নিজ ক্রোড় হইতে নিক্ষেপ করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছে; ফলে, একটি নূতন ভগবান-গোলার সৃষ্টি হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান এক্ষণে পুরাতন ভগবানগোলা নামে অভিহিত হইতেছে। নূতন ভগবানগোলাকে লোকে কখন কখন আলাতলীও বলিয়া থাকে। পুরাতন ভগবানগোলা হইতে নূতন ভগবানগোলা প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

মোতিঝিল

মোতিঝিল বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা ভাগীরথীর গর্ভে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। মুর্শিদাবাদের নিকটে ভাগীরথী স্থানে স্থানে বক্র-গতি অবলম্বন করিয়াছে। পুরাতন খাদগুলি কোন স্থানে শুষ্ক, কোথাও বা বদ্ধ বিলে পরিণত হইয়াছে; মোতিঝিল ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কত কাল পূর্ব্বে মোতিঝিল স্রোতঃশালিনী ভাগীরথীর গর্ভে ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উভয় পার্শ্বের প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায়, ইহা অশ্বপদাকৃতি ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ইহার গর্ভে অনেক শুক্তি পাওয়া যাইত বলিয়া, ইহা মোতিঝিল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাশ্মীর, লাহোর প্রভৃতি স্থানেও এই নামের জলাশয় দৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মোতিঝিলের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার সুন্দর অবস্থান দেখিয়া যখন নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ ইহার পশ্চিম তীরে আপনার প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করান, সেই সময় হইতে ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি। ইতিহাসে উল্লিখিত না হইলেও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে, ইহার পূর্ব্ব-তীরে রাধামাধব-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানেরই

কথা সাধারণে অবগত আছে। সম্ভবতঃ তৎকালে মোতিঝিল ভাগীরথীর গর্ভেই অবস্থিত ছিল।

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের দমনার্থ জীবনের অধিকাংশ সময় সমরক্ষেত্রে যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমরক্ষেত্রে অবস্থান-কালে তাঁহার বেগম শর্‌ফুন্নেসা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁর উপর মুর্শিদাবাদ-রক্ষার ভার থাকিত। নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ই মুর্শিদাবাদে বাস করিতে হইত, এজন্য তাঁহার সহকারী হোসেনকুলী খাঁর হস্তে ঢাকার শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল। নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ অত্যন্ত বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থিত স্বীয় প্রাসাদ তাঁহার সর্ব্বদা ভাল লাগিত না। এই সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যভার দিবেন বলিয়া অভিলাষ প্রকাশ করিলে, তাঁহার পরিবার-মধ্যে ভীষণ অন্তর্দ্দ্বন্দের সূত্রপাত হয়। সিরাজ ধীরে ধীরে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। সিরাজের প্রভুত্ব অসহ্য বিবেচনা করিয়া, নওয়াজেস রাজধানী হইতে কিছু দূরে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ও প্রবল ছিল; তাহারা দুই-একবার মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনও করিয়াছিল। সুতরাং নওয়াজেস একটি সুরক্ষিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অশ্বপদাকৃতি মোতিঝিলের মনোরম অবস্থান দেখিয়া, তিনি ইহার তীরে স্বীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইবার আয়োজন করিলেন।

বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের অগণ্য ভগ্নস্তূপ হইতে মর্ম্মর প্রস্তর ও প্রস্তর-স্তম্ভ আনীত হইয়া প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। ভবনটি কয়েকটি চত্বরে বিভক্ত হইয়াছিল; চত্বরগুলি পরস্পর হইতে সামান্য ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। প্রত্যেক চত্বর দুইটি বৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; প্রাচীরগুলি প্রত্যেক দিকেই ঝিলের জল স্পর্শ করিত। দুই তিন শ্রেণী লঘুকায় স্তম্ভ-দ্বারা চত্বরের ছাদ সুরক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রাসাদের গৃহগুলি তাদৃশ সুবিস্তৃত ছিল না। তৎকালে মুসল্‌মানদিগের গৃহ প্রায়ই সুবিস্তৃত হইত না; অনেকস্থলে এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাসাদের সোপানাবলী সলিলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ছিল। প্রাসাদের চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া একটি রমণীয় কানন নির্ম্মাণ

করা হয়। ফল-পুষ্পে শোভমান, বৃক্ষরাজি-সমন্বিত রম্য-কাননের মধ্যস্থ, জল-মধ্যগত-সোপানাবলী-সংলগ্ন সুচারু প্রাসাদটি পর-পার হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন উদ্যান-সহিত তাহা ঝিল-মধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিতেছে। মোতিঝিলের বৃক্ষবাটিকা তিন দিকে স্বাভাবিক পরিখায় বেষ্টিত ছিল; কেবল পশ্চিম দিকে তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ তাহাকে সুরক্ষিত করেন। উক্ত তোরণদ্বারের চিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে।

নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ অত্যন্ত মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। মস্জিদ ও অতিথিশালার জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। দরিদ্র ও আর্ত্তদিগের জন্য তাঁহার মাসিক ৩৭,০০০ টাকা ব্যয়িত হইত। মুর্শিদাবাদের বিপন্ন বিধবা ও অনাথ মাত্রেই তাঁহার পোষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি অত্যন্ত ধীর-প্রকৃতি ও স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। সিরাজুদ্দৌলার ভ্রাতা এক্রামুদ্দৌলাকে তিনি পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। বসন্তরোগে এক্রামুদ্দৌলার প্রাণবিয়োগ হইলে, তাঁহাকে মোতিঝিলের মস্জিদ-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ এক্রামের শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন; বাস্তবিকই তৎকালে তিনি হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। সকল কার্য্যে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি ভয়ঙ্কর শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। আলীবর্দ্দী তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া সুচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। সিরাজুদ্দৌলার ভয়ে ঘসেটী বেগম পুনর্ব্বার তাঁহাকে নগর-মধ্যস্থ স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন; তথায় তিনি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে মোতিঝিলের মস্জিদ-প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রিয়তম এক্রামের সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর ঘসেটী বেগম আপনার যাবতীয় সম্পত্তি লইয়া মোতিঝিলের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। ঘসেটী বেগম সিরাজের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে, আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজই বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। আত্মরক্ষার কারণে,

ঘসেটী পরলোকগত স্বামীর সৈন্যদিগকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া সিরাজের সিংহাসনারোহণে বাধা-প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করেন। প্রায় দশ সহস্র সৈন্য প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক একবাক্যে তাঁহার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। হোসেনকুলী খাঁর হত্যার পরে রাজা রাজবল্লভ ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন; আলীবর্দ্দীর মৃত্যু-সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। ঘসেটী বেগম রাজবল্লভকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। বেগমের রক্ষার জন্য রাজা গোপনে কাসিমবাজারের ইংরেজ-কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্‌-এর সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজুদ্দৌলা মোতিঝিল আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। সেই সময়ে ঘসেটী বেগমের বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারী মীর নজর আলী অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মোতিঝিলে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহারই কুপরামর্শে ঘসেটী সিরাজকে বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। সিরাজের সৈন্যগণ মোতিঝিল আক্রমণ করিলে, মীর নজর আলী অনন্যোপায় হইয়া সিরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ দোস্ত মোহম্মদ খাঁ ও রহিম খাঁকে প্রচুর উপহারাদি প্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু মোতিঝিল সিরাজের হস্তগত হইল। পরে যাবতীয় সম্পত্তি-সহ ঘসেটী বেগম ধৃত হইয়া সিরাজের নিকট নীত হইলে, সিরাজ তাঁহাকে বন্দী-অবস্থায় রাখিবার আদেশ প্রদান করেন।

মোতিঝিলের তীরস্থ ভূভাগ তিন দিকে সলিল-বেষ্টিত হওয়ায় অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাসিমের সৈন্যগণ ইংরেজদিগের হস্ত হইতে মুর্শিদাবাদ-রক্ষার জন্য মোতিঝিলে শিবির-সন্নিবেশ করে; কিন্তু মেজর আডাম্‌স্‌-এর অধীন ইংরেজ-সৈন্যদল-কর্ত্তৃক তাহারা পরাজিত হইলে, নগরাধ্যক্ষ সৈয়দ মোহম্মদ খাঁ সুতীতে পলায়ন করেন। ইংরেজগণ মুর্শিদাবাদ অধিকার করিয়া মীরজাফরকে পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রদান করেন।

ইংরেজ-অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে মোতিঝিলের প্রাসাদে প্রতিবৎসর পুণ্যাহ সম্পন্ন হইত। ইংরেজদিগের দেওয়ানী-গ্রহণের পর, ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ এপ্রিল মোতিঝিলে প্রথম পুণ্যাহ হয়। নবাব নজ্‌মুদ্দৌলা সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এবং নানাবিধ হীরা ও মণিমাণিক্য-খচিত অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-নাজিম-রূপে মস্‌নদে উপবিষ্ট হন।

বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর ভার-প্রাপ্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি-রূপে ক্লাইব তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মোহম্মদ রেজা খাঁ ও অন্যান্য অমাত্য ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ, বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হন। বাঙ্গলার যাবতীয় রাজা ও জমীদার জোড়হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। চোব্‌দার ও সৈন্যগণ পতাকা-হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। মোতিঝিলে অসংখ্য তরণী সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল।

এই মোতিঝিলেই স্যর জন্ শোর ১৭৭১ হইতে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি প্রাচ্য-ভাষায় ব্যুৎপত্তি-লাভ করেন।

অনেকদিন পর্য্যন্ত মোতিঝিল ইংরেজদিগের রাজকার্য্যের কেন্দ্রস্থল ছিল।

হীরাঝিল

নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাধের হীরাঝিল এবং তদুপরিস্থিত প্রাসাদ কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মোগলসম্রাট্ শাহ্-জাহানের ন্যায় সিরাজেরও সৌন্দর্য্য-প্রীতির কথা শুনা যায়। সিরাজ বড় সাধ করিয়া হীরাঝিল নির্ম্মাণ করান। তাঁহার যৌবরাজ্য-কালে হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়া সেই প্রাসাদে মহানন্দে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার বিধানে সিংহাসনারোহণের কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরেই তিনি ইহজগৎ হইতে চির-বিদায় লইতে বাধ্য হন।

এই প্রাসাদেই সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লুৎফন্নেসার সহিত বাস করিতেন এবং রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই একে একে সকল প্রকার বিলাস-বিভ্রম বিসর্জন দিয়া, আলীবর্দ্দীর সিংহাসনের পবিত্রতা-রক্ষার্থ যত্নশীল হইয়াছিলেন। হীরাঝিলের প্রাসাদকে দেশীয়গণ মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ

বলিয়া থাকেন। সিরাজ উক্ত প্রাসাদে মস্‌নদ স্থাপন করিয়া দরবার-কার্য্য সমাধা করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য আমোদ-প্রমোদ পর্য্যন্ত সিরাজের সমস্ত ব্যাপারই হীরাঝিলের প্রাসাদে সম্পাদিত হইত।

এই প্রাসাদটি সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু স্থানে স্থানে প্রস্তর বসাইয়া সিরাজ তাহার শোভা-বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের তরঙ্গায়িত পলগুলি কার্নিসের অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত। ভিন্ন ভিন্ন সুবৃহৎ চত্বরে প্রাসাদটি বিভক্ত ছিল; চত্বরগুলি এরূপ বৃহৎ ছিল যে প্রত্যেকটিই যেন এক একটি প্রাসাদ।—কোনটি এম্‌তাজ-মহল, কোনটি বা রঙ্গমহল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। সেই সুন্দর প্রাসাদ এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল যে, কাহারও কাহারও মতে তাহাতে তিনজন ইউরোপীয় নরপতি অনায়াসে বাস করিতে পারিতেন। প্রাসাদের প্রান্তদেশে একটি কৃত্রিম ঝিল খনন করিয়া, তাহার হীরাঝিল নাম প্রদান করা হইয়াছিল। ঝিলের উভয় পার্শ্ব ইষ্টক-দ্বারা বাঁধান হয়। সম্ভবতঃ নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁর মোতিঝিলের অনুকরণে সিরাজের হীরাঝিল নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

এই সুরম্য প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে সিরাজ মাতামহ আলীবর্দ্দী খাঁকে প্রাসাদ-দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বৃদ্ধ নবাবের সহিত অনেক কর্ম্মচারী, রাজা, জমীদার ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণও ভাবী নবাবের সুরম্য প্রাসাদ দেখিতে আগমন করিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ প্রাসাদ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; তাঁহার অনুচরবর্গও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিরাজের রুচির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যখন সকলে ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে বা প্রকোষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৃদ্ধ নবাব কোন একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিরাজ মাতামহের সহিত কৌতুকচ্ছলে তাহাকে সেই প্রকোষ্ঠ-মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নবাব দৌহিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আজ তোমারই জয় হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে কি উপহার দিলে আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে?" সিরাজ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "আমার প্রাসাদের জন্য কোন আর্থিক বন্দোবস্ত করিয়া না দিলে, ইহার নির্ম্মাণ-শেষ ও সৌন্দর্য্য-রক্ষা হইবে না; অতএব আমার

নিবেদন এই যে, এই সকল জমীদার ও জমীদারদিগের প্রতিনিধির নিকট হইতে একটি কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হউক।” নবাব সন্তুষ্ট-চিত্তে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, হীরাঝিলের প্রাসাদের জন্য কেবল যে বিশেষ একটি কর ধার্য্য করিলেন এমন নহে, সেই সঙ্গে সিরাজের জন্য একটি গঞ্জও স্থাপন করিয়া দিলেন। কথিত আছে, ইহা হইতে বার্ষিক ৫,০১,৫৯৭ টাকা আব্ওয়াব আদায় হইত। সিরাজের মন্সরু-ল্-মুল্ক উপাধি হইতে প্রাসাদের নাম মন্সুরগঞ্জের প্রাসাদ এবং নব-স্থাপিত গঞ্জটিও মন্সুরগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে গঞ্জটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকে অদ্যাপি মন্সুরগঞ্জ বলিয়া থাকে।

নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেও, সিরাজ কেল্লার পরিবর্ত্তে মন্সুরগঞ্জেই মস্নদ স্থাপন-পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পর রাজ্যচ্যুত হইলে, তিনি কিয়ৎপরিমাণ সম্পত্তি লইয়া প্রিয়তমা মহিষী লুৎফুন্নেসার সহিত নিশীথে সাধের হীরাঝিলের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইহার পরে সিরাজকে হীরাঝিলের প্রাসাদে আর পদার্পণ করিতে হয় নাই ; পথিমধ্যে ধৃত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত এবং পরে জাফরাগঞ্জে নৃশংসভাবে নিহত হন।

পলাশী-প্রান্তর হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর মীরজাফর সিরাজের পলায়নের কথা শুনিয়া মন্সুরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করেন ; কিন্তু তিনি ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বে মস্নদে উপবিষ্ট হন নাই। ক্লাইব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, হীরাঝিলের উত্তরে মোরাদবাগে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। মোরাদবাগ হইতে ক্লাইব মন্সুরগঞ্জের প্রাসাদে মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মন্সুরগঞ্জের প্রাসাদের দরবার-গৃহের উত্তর দিকে বিশাল নবাবী মস্নদ স্থাপিত ছিল; সিরাজ সেই মস্নদে বসিতেন। ক্লাইব মীরজাফরের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সেই মস্নদে উপবেশন করাইলেন এবং মীরজাফর সমস্ত নগরে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

অতঃপর, হীরাঝিলের প্রাসাদস্থিত সিরাজুদ্দৌলার ধনাগার-লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হইল। মীরজাফর, ক্লাইব, তাঁহার সহকারী ওয়াল্স, কাসিমবাজারের ওয়াট্স, লুশিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুন্শী নবকৃষ্ণ প্রভৃতি সেই কোষাগার-লুণ্ঠনের

সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সিরাজুদ্দৌলার এই প্রকাশ্য-ধনাগারে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক অ-মুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স অলঙ্কারে ব্যবহারোপযোগী হীরা-জহরৎ ও ২ বাক্স চুনী, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকাশ্য-ধনাগার ব্যতীত সিরাজুদ্দৌলার অন্তঃপুরস্থ আরও একটি ধনভাণ্ডারের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তৎকালে অর্থশালী ভারতবাসী-মাত্রেই নিজ নিজ অন্তঃপুরে একটি স্বতন্ত্র ধনাগার স্থাপন করিতেন, নবাব বাদশাহের তো কথাই নাই। কথিত আছে যে, সিরাজুদ্দৌলার অন্তঃপুরস্থ ধনাগার-মধ্যে ৮ কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল, ইংরেজেরা নাকি তাহার কোনও সন্ধান পান নাই; তাহা মীরজাফর, তাঁহার কর্ম্মচারী আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রামচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময়ে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন; কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে তাঁহার নগদে ও হুণ্ডীতে ৭২ লক্ষ টাকা ও ৪০০টি বড় বড় কলস থাকার উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে ৮০টি সুবর্ণময় ও অবশিষ্টগুলি রৌপ্য-নির্ম্মিত; এতদ্ব্যতীত তাঁহার ১৮ লক্ষ টাকার জমীদারী ও ২০ লক্ষ টাকার জহরৎও ছিল। নবকৃষ্ণও মাসে ৬০ টাকা বেতন পাইতেন; তিনিও নাকি মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগমও হীরাঝিলের প্রাসাদ-লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থেই অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বরী হন; তাঁহার যাবতীয় হীরা-জহরৎ এই লুণ্ঠন হইতেই লব্ধ।

মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরেজেরা ৩,৩৮,৮৫,৭৫০ টাকা প্রাপ্ত হন; কিন্তু সমস্ত টাকা একবারে দেওয়া হয় নাই। ঐ টাকার অধিকাংশ সিরাজের প্রকাশ্য ধনভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ধনাগার উন্মুক্ত হইবামাত্র তাহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপে সিরাজের সমস্ত সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়। সিরাজের প্রাসাদ ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এখনও অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমে হীরাঝিলের প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন; পরে, তিনি ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে কেল্লার মধ্যে আলীবর্দ্দীর

প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন। নবাব হইবার পূর্ব্বে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ মীরজাফরের আবাসস্থান ছিল; মসনদে উপবেশন করার পর, তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র মীরনকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ প্রদান করেন।

অনন্তর মীরকাসিম মসনদে বসিলে, গবর্নর ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে হীরা-ঝিলের প্রাসাদে বাস করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু মীরজাফর তাহাতে সম্মত হন নাই। মীরকাসিমের সহিত যখন ইংরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে মীরকাসিম শেঠদিগকে ইংরেজদিগের পক্ষপাতী জানিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মোহম্মদ তকী খাঁকে আদেশ দেন। মোহম্মদ তকী খাঁ শেঠদিগকে বন্দী করিয়া প্রথমে হীরাঝিলের প্রাসাদেই রাখেন।

ইহার পর হইতে আর হীরাঝিল-সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। এক্ষণে সে প্রাসাদ কাল-গর্ভে অন্তর্হিত। মীরজাফরের সময় হইতেই তাহা ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছিল। তাহার উপকরণ লইয়া কেল্লার মধ্যস্থিত অনেক প্রাসাদ ও অন্যান্য লোকের অনেক অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। জাফরাগঞ্জের পর-পারে অদ্যাপি তাহার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়াছে। হীরাঝিল ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; ভাগীরথীর জল কমিয়া গেলে, হীরাঝিলের পোস্তার কিয়দংশ ও একটি পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজুদ্দৌলার প্রাসাদকে সাধারণে নীলকুঠী বলিত, সে প্রাসাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত; কেবল এমতাজ-মহল নামক চত্বরের ভিত্তির কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। সিরাজুদ্দৌলার প্রায় সমস্ত চিহ্নই এখন মুর্শিদাবাদ হইতে লোপ পাইয়াছে; কেবল ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীরে তাঁহার নির্ম্মিত মদীনাটি ও 'সিরাজুদ্দৌলার বাজার' প্রভৃতি দুই একটি স্থান অদ্যাপি তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

হীরাঝিলের অব্যবহিত দক্ষিণে একটি অট্টালিকার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই অট্টালিকাটি রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের। রায়দুর্লভ সিরাজের রাজত্বকালে মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং মীরজাফরের সময়ে দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হীরাঝিলের নিকটেই তাঁহার বাসভবন ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ ও ভূগর্ভ-প্রোথিত সোপানাবলীর কয়েকটি

সোপানও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহেন্দ্র-সায়র নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের নাম ঘোষণা করিতেছে। বর্ষাকালে তাহার সহিত ভাগীরথীর সংযোগ হয়। এক্ষণে কৃষকগণ রায়দুর্লভের সেই বাসভবনের ভূমি কর্ষণ করিয়া তথায় শস্য বপন করিয়া থাকে।

খোশ্‌বাগ

মুর্শিদাবাদ হইতে দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী বাহিয়া গমন করিতে হইলে, লালবাগ নামক স্থানের কিছু দক্ষিণে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানবাটিকা নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। এই উদ্যানবাটিকা একটি সমাধি-ভবন। যেখানে সমাধি-ভবনটি অবস্থিত, তাহাকে সাধারণতঃ লোকে খোশ্‌বাগ কহে। এই খোশ্‌বাগের সমাধি-ভবনে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ও হতভাগ্য সিরাজ চিরনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গ অনন্ত শান্তি উপভোগ করিতেছেন। এই স্নিগ্ধচ্ছায়া-সমন্বিত শান্তিনিকেতন খোশ্‌বাগ মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থান। এখানে আসিলে, আলীবর্দ্দী ও সিরাজের অনেক কথা মনে উদয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই মহারাষ্ট্রীয়-যুদ্ধ, সেই আফগান-সমর, পলাশী-রণক্ষেত্রে মুসল্‌মান রাজলক্ষ্মীর সেই মর্ম্মভেদী বিদায়-দৃশ্য—সমস্ত চিত্র ধীরে ধীরে মানসপটে ফুটিয়া উঠে।

খোশ্‌বাগের সমাধি-ভবন প্রধানতঃ দুইটি চত্বরে বিভক্ত। প্রথম চত্বরটি প্রবেশ-দ্বার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির পশ্চিম দিকে। এই দ্বিতীয় চত্বরে প্রবেশ করিবার জন্য আর একটি প্রবেশ-দ্বার আছে। ভাগীরথী-তীর হইতে অতি অল্প দূরেই খোশ্‌বাগের সমাধি-ভবন অবস্থিত; ইহার চতুর্দ্দিক্‌ প্রাচীর-বেষ্টিত।

এই প্রাচীর-বেষ্টিত সমাধি-স্থানটির উত্তর দিকে একটি উচ্চ স্থানে ১৭টি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার কোন কোনটিতে ফারসী অক্ষর ক্ষোদিত আছে। পূর্ব্ব চত্বর ও পশ্চিম চত্বরের মধ্যস্থ প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়া পশ্চিম চত্বরে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি সমাধি-গৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; সমাধি-গৃহাভ্যন্তরে সর্ব্বশুদ্ধ ৭টি সমাধি আছে। মধ্যস্থলে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড-মণ্ডিত সমাধি-তলে বাঙ্গলার আদর্শ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ চির-শায়িত আছেন। আফগান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের অবিশ্রান্ত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যখন তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিস্থাপন-পূর্ব্বক কিছুদিনের জন্য শান্তি-লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পরিবার-মধ্যে নানা দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দীন ইতিপূর্ব্বেই আফগান-হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। তাহার পর নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁ ও দ্বিতীয় ভ্রাতা সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁও একে একে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সমস্ত কারণে শোকার্ত্ত বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। তিনি নিদারুণ শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে সিরাজুদ্দৌলার সহিত ঘসেটী বেগমের বিবাদ গুরুতরভাবেই চলিতেছিল। ঘসেটী যে ইংরেজদিগের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন, আলীবর্দ্দী সে-কথা জানিতে পারিলেন। তিনি ইংরেজদিগের রাজ্য-লালসার কথা বুঝিতে পারিয়া, সিরাজকে এই উপদেশ দিয়া যান, "ইংরেজদিগকে যেরূপে পার দমন করিয়া রাখিবে; ইংরেজদিগকে দমন করিতে না পারিলে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য অধিকার করিয়া বসিবে।"

মৃত্যুর করাল ছায়া আলীবর্দ্দীকে ধীরে ধীরে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বাঙ্গলার আদর্শ নবাব, হিন্দু-মুসল্‌মানের পরম মিত্র, মহারাষ্ট্রীয় আফগানদিগের দর্পচূর্ণকারী, মহামহিমান্বিত আলীবর্দ্দী খাঁ মোহবৎজঙ্গ অনন্তকালের জন্য মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নবাবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অনুচরবর্গ রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতে তাঁহার মৃতদেহ খোশ্‌বাগে তাঁহার মাতার সমাধি-স্থলে আনিয়া উপস্থিত করেন; পরে সেই মৃতদেহ যথারীতি সমাহিত করা হয়।

আলীবর্দ্দীর সমাধির অব্যবহিত পূর্ব্বভাগে তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলা শায়িত রহিয়াছেন। পলাশী-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজ বেগম লুৎফুন্নেসার সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন এবং রাজমহলের নিকটে ধৃত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে আনীত হন। তাহার পর সেখানে তাঁহার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যখন সিরাজুদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে আনীত হন, সেই সময়ে মীরজাফর মাদক-সেবনে বিভোর হইয়া মধ্যাহ্ন-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মীরন সিরাজুদ্দৌলার উপস্থিতির সংবাদ শ্রবণ-মাত্র জাফরাগঞ্জের বাটীতে তাঁহাকে বন্দী করিয়া, একে একে অনুচরবর্গের নিকটে হতভাগ্যের জীবন-নাশের প্রস্তাব করেন; কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। অবশেষে মোহম্মদী বেগ নামে এক দুরাত্মা এই নৃশংস-কার্য্য-সম্পাদনে স্বীকৃত হইল। এই মোহম্মদী বেগ সিরাজুদ্দৌলার পিতা ও মাতামহীর অন্নে প্রতিপালিত হয়; শরফুন্নেসা বেগম একটি অনাথা কুমারীর সহিত তাহার বিবাহও দিয়াছিলেন। মোহম্মদী বেগ সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সিরাজের হত্যা-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। পাষণ্ড অস্ত্র-হস্তে সিরাজের কক্ষে প্রবেশ করিলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবনের অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই। তখন তিনি নত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে, আপনার অতীত কার্য্যাবলীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি ঘাতকের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তাহারা কি আমাকে রাজ্যের কোন নির্জ্জন প্রান্তে সামান্য-জীবিকা-অবলম্বনে দিনপাত করিতেও দিবে না?" অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তাহারা তাহা করিবে না; আমাকে হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর জন্য অবশ্যই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে।" এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিবামাত্র সেই কৃতান্ত-দূত-স্বরূপ ঘাতক সিরাজের অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহযষ্টিতে উপর্য্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল। সিরাজের উত্তপ্ত শোণিতধারায় বসুন্ধরা রঞ্জিত হইল। "যথেষ্ট হইয়াছে, হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ হইল,"—এই কথা বলিতে বলিতে সিরাজ ধরাবলুণ্ঠিত হইলেন। এইরূপে কৃতঘ্ন চক্রান্তকারিগণের ষড়্‌যন্ত্রে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজের জীবন-লীলার অবসান হইল। অতঃপর সিরাজের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ

হস্তি-পৃষ্ঠে স্থাপিত হইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদ নগর পরিক্রমণ করিল। নিয়তি-চক্রের ভীষণ আবর্ত্তন দর্শনে জনসাধারণ শোকে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

অনন্তর সিরাজের দেহ-বাহী হস্তী তাঁহার মাতার বাসভবনের দ্বারে আনীত হইল। অন্তঃপুর-মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, আমিনা বেগম এই মহাবিপ্লবের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। চারিদিকে গোলযোগ শুনিয়া, কারণানুসন্ধানে তিনি সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন; তখন তিনি পুত্রশোকে আত্মবিস্মৃত হইয়া, অবগুণ্ঠন উন্মোচন-পূর্ব্বক দ্রুতপদে রাজপথ-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাঁহার অনাবৃত মুখমণ্ডল দর্শনের সৌভাগ্য সবিতৃদেবের পক্ষেও সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না, পুত্রের তাদৃশ শোচনীয় পরিণামের সংবাদ-শ্রবণে তিনি আজ উন্মুক্ত রাজপথে সর্ব্বসমক্ষে সমুপস্থিত। অনন্তর তিনি হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে তনয়ের মৃতদেহ নামাইয়া উহা পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং তাহা বক্ষঃস্থলে ধারণ-পূর্ব্বক ছিন্নমূলা ব্রততীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। এই করুণ দৃশ্যে নগরবাসিগণের হৃদয় বিগলিত ও বদনমণ্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল। প্রকাশ্য রাজপথে নবাব আলীবর্দ্দীর কন্যা ও সিরাজুদ্দৌলার জননীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, খাদেম হোসেন খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান অনুচর-সহ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে বল-পূর্ব্বক অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর সিরাজের মৃতদেহ নদীর পর-পারে খোশ্‌বাগে প্রেরিত ও আলীবর্দ্দীর পার্শ্বে সমাহিত হইল। সিরাজের শোচনীয় পরিণামের কথা মনে হইলে হৃদয় কারুণ্যরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

সিরাজের পূর্ব্ব-পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা মীর্জা মেহ্‌দী সমাহিত রহিয়াছেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে মীরজাফরের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁহারও হত্যাকাণ্ডে মীরন নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরজাফর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর, রায়দুর্লভের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। সেই সময়ে আলীবর্দ্দীর ও সিরাজের পরিবারবর্গ এবং মীর্জা মেহ্‌দী বন্দী-দশায় বাস করিতেছিলেন। রায়দুর্লভ মীর্জা মেহ্‌দীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, পাছে তিনি মীর্জা মেহ্‌দীকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করেন, এই আশঙ্কা করিয়া, মীরজাফর

মীর্জা মেহ্‌দীর বিনাশের জন্য মীরনকে আদেশ দেন। হত্যাকাণ্ড-ব্যাপারে মীরন বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন।—তিনি তৎক্ষণাৎ মীর্জা মেহ্‌দীর হত্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশ-অনুসারে মীর্জা মেহ্‌দীর দুই পার্শ্বে দুইখানি তক্তা সুদৃঢ় রজ্জু-বেষ্টন-দ্বারা চাপিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করা হয়। পঞ্চদশ-বৎসর-বয়স্ক বালকের এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কথা যে শুনিয়াছিল, তাহারই নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছিল। এই নৃশংস হত্যার পর মীর্জা মেহ্‌দীর মৃতদেহ খোশ্‌বাগে সিরাজের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

সিরাজের দক্ষিণে, তাঁহার পদতলে, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফুন্নেসা চির-নিদ্রিত। স্বামীর মৃত্যুর পর কিছুকাল ঢাকায় নির্ব্বাসন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার মুর্শিদাবাদে আসিয়া খোশ্‌বাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন, এবং মৃত্যুর পরে স্বামীর পদতলে সমাহিত হন।

লুৎফুন্নেসার পূর্ব্ব-পার্শ্বে, মীর্জা মেহ্‌দীর দক্ষিণে, আর একটি সমাধি আছে। সাধারণ লোকে তাহাকে মীর্জা মেহ্‌দীর বেগমের সমাধি বলিয়া থাকে; কেহ কেহ তাহাকে সিরাজের আর কোন বেগমের সমাধিও বলে। বালক মীর্জা মেহ্‌দীর বিবাহ হইয়াছিল কিনা, তাহা সঠিক জানা যায় না; সুতরাং উক্ত সমাধিটি সিরাজের অপর কোন বেগমের সমাধি হইলেও হইতে পারে। সম্ভবতঃ উহা সিরাজ-বেগম ওম্‌দাতুন্নেসার সমাধি হইবে।

আলীবর্দ্দীর সমাধির দক্ষিণে যে সমাধিটি রহিয়াছে, তাহা তাঁহার মহীয়সী বেগম শরফুন্নেসার সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

আলীবর্দ্দীর সমাধির পশ্চিম দিকে আরও দুইটি সমাধি আছে। সাধারণ লোকে ঐ দুইটিকে আলীবর্দ্দীর কন্যাদ্বয়ের সমাধি বলিয়া জানে। মীরনের আদেশে আলীবর্দ্দীর দুই কন্যা ঘসেটী ও আমিনাকে পদ্মা-গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া হত্যা করা হয়; সুতরাং খোশ্‌বাগে তাঁহাদের সমাহিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। আলীবর্দ্দীর মধ্যমা কন্যা ময়মুনা পূর্ণিয়ার নবাব সৈয়দ আহ্‌মদের পত্নী ও শওকৎজঙ্গের মাতা ছিলেন, এবং তিনি পূর্ণিয়াতেই বাস করিতেন; মীরজাফর পূর্ণিয়া অধিকার করিলে, তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না। ফলতঃ উক্ত সমাধি দুইটি আলীবর্দ্দী খাঁর কন্যাদ্বয়ের না হইলেও, তাঁহার পরিবার-ভুক্ত অন্য কাহারও হইতে পারে।

আলীবর্দ্দী এই খোশ্‌বাগের প্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার জননী সমাহিত হইয়াছিলেন। খোশ্‌বাগ সমাধি-ভবনের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য আলীবর্দ্দী ভাণ্ডারদহ, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের আয় হইতে মাসিক ৩০৫ টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফুন্নেসার উপর খোশ্‌বাগের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফস্টার নামে কোন ইংরেজ খোশ্‌বাগে লুৎফুন্নেসাকে সিরাজের জন্য শোক প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলেন।

কাসিমবাজার

নেমিনাথের মন্দির

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংসের পর কাসিমবাজার নিম্ন-বঙ্গে বাণিজ্য-বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী হইবার পূর্ব্ব হইতে কাসিমবাজারের নাম পাশ্চাত্ত্য-জগতে বিঘোষিত হইয়াছিল। ভাগীরথীর যে অংশ পদ্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া জলঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই অংশকে ইউরোপীয়গণ সচরাচর 'কাসিমবাজার নদী' নামে অভিহিত করিতেন, এবং পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যস্থিত ত্রিকোণ ভূভাগ 'কাসিমবাজার দ্বীপ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুটান-নামক জনৈক ইউরোপীয় কাসিমবাজারকে রেশম ও মস্‌লিনের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার বর্ণনায় কাসিমবাজারে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির কুঠীর উল্লেখ দেখা যায়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ কেন্ বার্ষিক ৪০ পাউণ্ড বেতনে কাসিমবাজারের ইংরেজ-কুঠীর প্রথম অধ্যক্ষ এবং জোব চার্নক তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে জোব চার্নক কাসিমবাজার-কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। [এই চার্নকই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করেন।] ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব

শায়েস্তা খাঁর কঠোর আদেশে কাসিমবাজার-কুঠীও বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ইংরেজ-কুঠীর ন্যায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। ইহার পর ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলে, কাসিমবাজার-কুঠীর পুনর্নির্ম্মাণ হয়। সিরাজুদ্দৌলা যখন কাসিমবাজার-কুঠী আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সেখানে ওয়াট্‌স রেসিডেণ্ট ও ওয়ারেন হেস্‌টিংস সামান্য কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন।

কাসিমবাজারে ও তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে কাসিমবাজারে ইংরেজদিগের, কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের, শেতাখাঁর বাজারে আর্ম্মেনীয়দিগের ও সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কাসিমবাজার ও কালিকাপুরে ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের এক একটি সমাধিক্ষেত্র এবং শেতাখাঁর বাজারে আর্ম্মেনীয়দিগের একটি উপাসনা-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কাসিমবাজার-সমাধিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্‌টিংস-এর প্রথমা পত্নী মেরী ও শিশু কন্যা এলিজাবেথের সমাধি আছে। আর্ম্মেনীয়দিগের উপাসনা-মন্দিরে তাহার নির্ম্মাণাব্দ ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে। ফরাসীদিগের নির্ম্মিত সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বাঁধের ভগ্নাবশেষ আজিও ভাগীরথীর স্রোত প্রতিহত করিয়া সমস্ত নগরকে রক্ষা করিতেছে। সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গায় কূটনীতি-বিশারদ দ্যুপ্লে (Dupleix) কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সময়ে ল-নামক জনৈক ফরাসী এখানে অধ্যক্ষতা করিতেন; সিরাজের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। কাসিমবাজারের ইংরেজ-কুঠী বা রেসিডেন্সীর চাতালের সামান্য অংশ ব্যতীত অন্য কোন চিহ্নই এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। তৎকালে ভাগীরথী এই সকল স্থানের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইত; কিন্তু এখানে ভাগীরথীর বক্র-গতির জন্য কাসিমবাজার হইতে মুর্শিদাবাদে যাইতে অনেক সময় লাগিত। হল্‌ওয়েল লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহাকে বন্দী-অবস্থায় কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তিনি প্রাতঃকালে সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গা হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন।

কাসিমবাজারের প্রাচীন কালের চিহ্নের মধ্যে একটি জৈন-মন্দির মুর্শিদাবাদের জৈন মহাজনদিগের যত্নে অদ্যাপি সুরক্ষিত রহিয়াছে। এই

মন্দিরকে নেমিনাথের মন্দির বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের কুঠীর ন্যায় কাসিমবাজার অনেক দেশীয় মহাজনের আবাসস্থানেও পরিপূর্ণ ছিল। যে স্থানে নেমিনাথের মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম মহাজন-টুলী; ইহার চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ বাস করিতেন। নেমিনাথের মন্দিরের সম্মুখে জগৎশেঠদিগের একটি ব্যবসায়-ভবন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যত দিন হইতে কাসিমবাজার বাণিজ্যস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তত দিন হইতে নেমিনাথ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দির-মধ্যে নেমিনাথ, পার্শ্ব নাথ প্রভৃতি শ্বেতাম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের চতুর্বিংশতি মহাপুরুষের মূর্ত্তি আছে। নেমিনাথের মূর্ত্তি পাষাণময় ও সর্ব্বোচচ আসনে অবস্থিত; পার্শ্ব নাথের মূর্ত্তি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত। দক্ষিণ-দিকের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দিগম্বর-সম্প্রদায়ের কতিপয় দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-দিকের দালানের পর আর একটি প্রাঙ্গণ; তথায় একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে জৈন যতিগণের চরণ-পদ্ম অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণের এক স্থলে জগৎশেঠদিগের বাসভবন মহিমাপুর হইতে আনীত নিত্যাচন্দ্রজী নামক জনৈক যতির কষ্টিপাথরে অঙ্কিত চরণ-পদ্ম রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে, অর্থাৎ পূর্ব্ব-দিকে, একটি উদ্যান; উদ্যান-সংলগ্ন আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শান্তশূর, কুশলগুরু প্রভৃতি যতিগণের চরণ-পদ্ম অঙ্কিত আছে। উদ্যানের পশ্চাতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি পুরাতন পুষ্করিণী; পুষ্করিণীটির নাম মধুগ'ড়ে। চারিদিকে সোপানাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মধুগ'ড়ে সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের সময়ে মধুগ'ড়ের চতুষ্পার্শ্বের মহাজনেরা আপনাদিগের ধনসম্পত্তি চিহ্নিত করিয়া তাহার গর্ভে নিহিত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনেকে আর তাহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। মধুগ'ড়ের চতুর্দ্দিক্ এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ; বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকায় কুম্ভীরসকল ইহার গর্ভে বাস করিতেছে।

নেমিনাথের মন্দির ব্যতীত কাসিমবাজার-ব্যাসপুরে একটি সুন্দর শিব-মন্দির আছে; ব্যাসপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতা রামকেশব-কর্ত্তৃক ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির স্থাপিত হয়। মন্দিরটি নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট ইষ্টক-দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা অধিক পুরাতন নহে বলিয়া, আজিও দেখিবার উপযোগী রহিয়াছে।

কাসিমবাজারের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে বিষ্ণুপুর-নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ কালী-মন্দির বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরে পূজা উপলক্ষ্যে মধ্যে মধ্যে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরের কালী-মন্দির কৃষ্ণেন্দ্র হোতা নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। কৃষ্ণেন্দ্র হোতা কাসিমবাজারের ইংরেজ-কুঠীর গোমস্তা ছিলেন। হোতার অনেক সৎকীর্ত্তির নিদর্শন এতদঞ্চলে দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে সৈয়দাবাদের দয়াময়ীর মন্দির ও জাহ্নবী-তীরস্থ শিব-মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। খাগড়া-সৈয়দাবাদ হইতে বিষ্ণুপুরে আসিতে হইলে, একটি বিল অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া, হোতা সেখানে একটি সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; অদ্যাপি তাহা 'হোতার সাঁকো' নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণেন্দ্র হোতা পলাশীর যুদ্ধ, কোম্পানীর দেওয়ানী-গ্রহণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

জাফরাগঞ্জ

জাফরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদ-নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। জাফরাগঞ্জ সিরাজের বধ্যভূমি—বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধি-ক্ষেত্র। এই স্থানের ভূমি বিশ্বাসঘাতকের তরবারির আঘাতে কলুষিত হইয়াছিল; তাই যে ভবনে সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, মুর্শিদাবাদ-বাসিগণ অদ্যাপি তাহাকে 'নেমক্‌হারামী দেউড়ী' কহিয়া থাকে।

জাফরাগঞ্জ আবার বঙ্গের শেষ নবাব-নাজিমগণের সমাধি-ভবন। এই স্থানে মীরজাফর-বংশীয় নবাব-নাজিমগণ চির-নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। মীরজাফর খাঁর প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগম ও বব্বু বেগমও এই সমাধি-ভবনে শায়িত। ইহা মুর্শিদাবাদের একটি দর্শনীয় স্থান।

মস্‌নদে বসিবার পূর্ব্বে মীরজাফর জাফরাগঞ্জে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নাম-অনুসারে, অথবা মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর নাম-অনুসারে, কিংবা অন্য কাহারও নাম-অনুসারে জাফরাগঞ্জের নামকরণ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। নবাব হইয়া মীরজাফর স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র মীরনকে

জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ প্রদান করেন; তদবধি মীরনের বংশধরেরা জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে বাস করিতেছেন। জাফরাগঞ্জ-প্রাসাদের প্রাচীন দরবার-গৃহ এক্ষণে এমামবাড়ায় পরিণত হইয়াছে; কিন্তু উহার মহল-সরা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শাহ্জাদা আলী গওহরের বিরুদ্ধে বিহারে যুদ্ধ করিতে গিয়া মীরন প্রান্তর-মধ্যে বজ্রাঘাতে নিহত হন। সয়রু-ল্-মুতখ্খরীনে লিখিত আছে যে, মীরনের আদেশে সিরাজের মাতা আমিনা বেগম ও মাতৃষ্বসা ঘসেটী বেগমকে যখন জলমগ্ন করিয়া হত্যা করা হয়, তখন তাঁহারা মীরনকে অভিসম্পাত করিয়া যান, যেন বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই জন্য অনুমান করা হয় যে, মীরনের বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু মীরনের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া তৎকালে অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল। মীরনের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, তাঁহাকে নাকি মীরকাসিমের সাহায্যে কৌশল-পূর্ব্বক নিহত করা হইয়াছিল; পরে, উহা বজ্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া প্রকাশ করা হয়। উক্ত জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা, বলা যায় না; তবে তৎকালে সাধারণের মনে যে ঐরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মীরনের দেহ রাজমহলে সমাহিত করা হয়। রাজমহলের যে স্থানে মীরনের সমাধি আছে, তাহাকে শরীফা-বাজার কহে; সমাধিটি একটি অরণ্যময় উদ্যানবাটিকার মধ্যে অবস্থিত।

পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরেজদিগের সহিত মীরজাফরের যে গুপ্ত-সন্ধি হয়, তাহা প্রতিপালন করিতে মীরজাফর জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই শপথ-পূর্ব্বক স্বীকৃত হন। কাসিমবাজার-কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সিরাজের ভয়ে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আবৃত-শিবিকায় আরোহণ করিয়া একেবারে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করেন। মীরজাফর ও মীরন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে লইয়া যান; সেখানে মীরজাফর ইংরেজ-দিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং কোরান-শরীফ ও মীরনের মস্তক স্পর্শ করিয়া সন্ধির সমস্ত শর্ত্ত পালন করিতে অঙ্গীকার করেন। পলাশী-যুদ্ধের পর সিরাজ রাজমহলের নিকটে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলে, তিনি জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই নিহত হন। যে গৃহে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই গৃহ-মধ্যে মোহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া যায়। সিরাজের রক্তে জাফরাগঞ্জের যে গৃহ রঞ্জিত

হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে—তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। এখন সেখানে একটি প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

জাফরাগঞ্জে নবাব-নাজিমদিগের সমাধি-ভবন পশ্চিম মুখে রাজপথের উপর অবস্থিত। এই বিস্তৃত সমাধি-ভবন নবাব-বংশীয়দিগের সমাধি-দ্বারা এরূপ পরিপূর্ণ যে, তথায় ভ্রমণ করিতে গেলে শঙ্কা উপস্থিত হয়, পাছে অনবধানতা-বশতঃ কোন মৃতদেহের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শিত হইয়া পড়ে।

মীরজাফর খাঁ অতি-সম্ভ্রান্ত সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; হজরৎ মোহম্মদের কন্যা ফতেমা হইতে সৈয়দ-বংশের উৎপত্তি। অবস্থা হীন ছিল বলিয়া, মীরজাফর প্রথমে আলীবর্দ্দী খাঁর সংসারে প্রতিপালিত হন। তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব জানিয়া, আলীবর্দ্দী স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ্ খানুমের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। শাহ্ খানুমই মীরনের মাতা। শাহ্ খানুমের গর্ভজাতা মীরজাফরের কন্যাকে মীরকাসিম বিবাহ করিয়াছিলেন; শাহ্ খানুম তাঁহারই নিকটে বাস করিতেন। মীরজাফরের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে সেনাপতি-পদ প্রদান করেন। মহারাষ্ট্রীয়-যুদ্ধের সময়ে অসামান্য বীর্য্যবত্তা দেখাইয়া মীরজাফর সুনাম অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি বঙ্গরাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে আলীবর্দ্দীর ভ্রাতৃ-জামাতা আতাউল্লা খাঁর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করায়, আলীবর্দ্দী মীরজাফরকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। পরে ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মোহম্মদ খাঁর অনুরোধে আলীবর্দ্দী তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হইলে মীরজাফর সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের নেতা হইয়া, ইংরেজদিগের সহিত যোগদান-পূর্ব্বক সিরাজের সর্ব্বনাশ-সাধনের পর মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে উপবিষ্ট হন। মস্‌নদে বসিয়া তিনি ইংরেজদিগের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহাদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হইবার ইচ্ছা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র মীরনের সেই ইচ্ছা অধিকতর বলবতী ছিল। কিন্তু ইংরেজেরা মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসন প্রদান করেন। আবার মীরকাসিমের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পুনর্ব্বার মীরজাফরকে নবাব মনোনীত করেন। এই সময়ে মীরজাফর নন্দকুমারকে স্বীয় দেওয়ান

নিযুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া, অনেক কষ্টে কলিকাতা-কাউন্সিলের সভ্যগণের মত করাইয়া লন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নন্দকুমারের পরামর্শ-অনুসারে কার্য্য করিতেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে কুষ্ঠরোগে মীরজাফর প্রাণত্যাগ করেন।

মীরজাফরের সমাধির পশ্চিমে তাঁহার অন্যতম জামাতা ইস্‌মাইল খাঁর সমাধি; তাহার পশ্চিমে মীরজাফর-বংশীয় দ্বিতীয় নবাব নজ্‌মুদ্দৌলা শায়িত। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নজ্‌মুদ্দৌলা নিজামতী প্রাপ্ত হন। ক্লাইব নজ্‌মুদ্দৌলার সহিত মোতিঝিলে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নজ্‌মুদ্দৌলা দারুণ উদর-রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

অষ্টম নবাব-নাজিম হুমায়ুঁ-জাহের সমাধিই জাফরাগঞ্জের সর্ব্বশেষ সমাধি। হুমায়ুঁ-জাহের সময়ে মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এই পরম-সুন্দর প্রাসাদটির নির্ম্মাণ-কার্য্যে ন্যূনাধিক নয় বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল ম্যাক্‌লাউডের তত্ত্বাবধানে কেবল দেশীয় লোকের দ্বারা এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। প্রাসাদটিতে নবাব-নাজিমগণের এবং তাঁহাদের বংশধরদিগের অনেক চিত্র আছে। এই সুসজ্জিত সুরম্য প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বস্তু। ইহাতে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য চিত্র আছে, ভারতের প্রায় কোথাও সেরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রাসাদকে সাধারণতঃ হাজার-দুয়ারী বলা হয়। হাজার-দুয়ারী ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। হুমায়ুঁ-জাহ্ নির্জন-বাস ভালবাসিতেন, এই জন্য তিনি একটি মনোহর বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করান; তাহার নাম মেবারক-মঞ্জিল বা হুমায়ুঁ-মঞ্জিল। এই হুমায়ুঁ-মঞ্জিল পূর্ব্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিচারালয় ছিল। ইহার ন্যায় মনোহর স্থল মুর্শিদাবাদে অতি অল্পই আছে। এই স্থানে কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত একখানি গোলাকার মস্‌নদ আভ্যন্তরীণ চত্বর-প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। এই মস্‌নদ শাহ্-শুজার সময়ে নির্ম্মিত হয়। ইহা রাজমহল হইতে ঢাকায়, পরে তথা হইতে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে নবাব-নাজিমগণ ইহাতে উপবেশন করিতেন; এক্ষণে ইহা কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিভবনে রক্ষিত আছে। হুমায়ুঁ-জাহ্ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

হুমায়ুঁ-জাহের পর তাঁহার পুত্র মনসুর আলী খাঁ বা ফরীদুঁ-জাহ্ নিজামতের গদীতে উপবেশন করিয়াছিলেন। মনসুর আলীই বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম। তাঁহার সময়ে মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান এমামবাড়া নির্ম্মিত হয়। এই এমামবাড়া হুগলীর বিখ্যাত এমামবাড়া অপেক্ষাও বৃহৎ। বর্ত্তমান এমামবাড়া পুরাতন এমামবাড়ার নিকটেই নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন এমামবাড়া সিরাজুদ্দৌলা-কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। সিরাজের এমামবাড়া মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি দর্শনীয় অট্টালিকা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মোহরমের সময়ে তথায় দশ দিবস মহা ধুমধাম হইত; মীরজাফর প্রভৃতিও মোহরমের সময়ে তথায় গমন করিতেন। সিরাজের এমামবাড়ার অনুকরণে মুর্শিদাবাদের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিরাজের এমামবাড়া নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, নবাব-নাজিম মনসুর আলী খাঁ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নূতন এমামবাড়া নির্ম্মাণ করান। কথিত আছে যে, নূতন এমামবাড়া মাত্র ৮-১০ মাসের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মনসুর আলী খাঁর সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের সমস্ত গৌরবের অবসান হয়। তাঁহার সময়ে ইংরেজ গবর্নমেন্ট নিজামতের সম্মানের অনেক লাঘব করিয়া দেন। নবাব-নাজিমের ১৯ তোপ ১৩ তোপে পরিণত হয়। মোবারকুদ্দৌলার সময় হইতে নিজামৎ-বৃত্তির জন্য যে ১৬ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে নবাব নিজ ব্যয়ের জন্য ৭ লক্ষ টাকা পাইতেন। উক্ত ১৬ লক্ষ টাকা গবর্নর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে কমাইতে পারিবেন বলিয়া প্রকাশ করা হয়; কিন্তু মনসুর আলীর জীবদ্দশায় গবর্নমেন্ট তাহার হ্রাস করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পূর্ব্বে নবাবের অনুমতি ব্যতীত কেহ কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না; গবর্নমেন্ট নবাব-নাজিমকে সে অধিকার হইতেও বঞ্চিত করেন। এতদ্ব্যতীত মণি বেগম প্রভৃতির সঞ্চিত তহবিলে যে সমস্ত টাকা জমিয়াছিল, গবর্নমেন্ট নবাব-নাজিমকে তাহাও প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন।

লর্ড ডালহৌসির সময় হইতেই নবাব-নাজিমের গৌরব-হ্রাসের সূচনা হয়; পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গবর্নর-জেনারেলও তাঁহারই পন্থা অনুসরণ করেন। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নবাব-নাজিম স্টেট্-সেক্রেটারী স্যর চার্ল্‌স উডের নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন; এজন্য পরে তিনি স্বয়ং ইংলণ্ড যাত্রা করেন, কিন্তু ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গলায় প্রত্যাগত হইয়া, তিনি মনঃক্ষোভে 'বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-নাজিম' উপাধি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে তদ্বংশীয়েরা কেবল 'মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুর' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন; 'বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যা'র পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র 'মুর্শিদাবাদ' টুকুই এক্ষণে তাঁহাদের নামোপাধির সহিত বিজড়িত।

নবাব-নাজিমদিগের সমাধির উত্তরে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগম ও তাহার পূর্ব্ব-দিকে তাঁহার অন্যতমা ভার্য্যা বব্বু বেগম শায়িত আছেন। মণি বেগমের গর্ভে নজ্‌মুদ্দৌলা ও সৈফুদ্দৌলার এবং বব্বু বেগমের গর্ভে মোবারকুদ্দৌলার জন্ম হয়। সিরাজুদ্দৌলার হীরাঝিলের প্রাসাদ হইতে মীরজাফর যে সমস্ত হীরা-জহরৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মণি বেগম সে সমস্তই হস্তগত করেন। নবাব মোবারকুদ্দৌলার অভিভাবক হওয়ার জন্য মণি বেগম ও বব্বু বেগম উভয়েই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু মণি বেগমই মোবারকুদ্দৌলার অভিভাবকের পদ লাভ করেন। মণি বেগম ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি 'গদ্দীনশীন বেগম' পদ পাইয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর বেগম হইতে উক্ত পদের সৃষ্টি হয়। গদ্দীনশীন বেগমেরা বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন। মণি বেগমের বৃত্তি হইতে অনেক টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে গবর্নমেন্ট সেই টাকা নবাব-নাজিমকে প্রদান করেন নাই। মুর্শিদাবাদ-চকের মধ্যস্থিত মণি বেগমের বিখ্যাত মস্‌জিদ অদ্যাপি তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তিনি অত্যন্ত দানশীলা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের প্রতি সহৃদয়তা-হেতু তিনি 'মাদর্-ই-কোম্পানী' বলিয়া অভিহিত হইতেন।

গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে এবং বর্ত্তমান জঙ্গীপুর উপ-বিভাগের নিকটে, একটি বিশাল প্রান্তর ভাগীরথীর সলিলপ্রবাহ-দ্বারা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই প্রান্তরের সাধারণ নাম 'গিরিয়া'।

ইহার মধ্যস্থিত গিরিয়া নামক একটি প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে উক্ত প্রান্তরের নামকরণ হইয়াছে। ভাগীরথীর উভয়-তীরে অবস্থিতি-হেতু এই বিশাল প্রান্তরকে দুইটি পৃথক্ প্রান্তর বলিয়া বোধ হইলেও, ইহা একমাত্র গিরিয়া নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ গিরিয়া ব্যতীত অন্য কোনও প্রসিদ্ধ স্থান ইহার নিকটে না থাকায়, ভাগীরথীর উভয়-তীরস্থ চারি-পাঁচ-ক্রোশব্যাপী প্রান্তরের উক্ত নাম হইয়া থাকিবে। গিরিয়ার আয়তন সুপ্রসিদ্ধ পলাশী-প্রান্তর হইতেও বৃহৎ।

গিরিয়ার বিস্তৃত সমরক্ষেত্রকে কোন ঐতিহাসিক ' মুর্শিদাবাদের পানিপথ ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুবৃহৎ পানিপথ-ক্ষেত্র যেরূপ ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর নিকটে অবস্থিত, গিরিয়ার বিশাল রণভূমিও সেইরূপ বঙ্গরাজ্যের রাজধানী মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত। পানিপথের দুইটি যুদ্ধে যেরূপ মোগলসাম্রাজ্য-স্থাপনের সূচনা হয় এবং মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, গিরিয়ার দুইটি যুদ্ধেও সেইরূপ আলীবর্দ্দী খাঁর রাজ্য-প্রাপ্তি ও মীরকাসিমের বাঙ্গলা হইতে চির-বিদায় সংঘটিত হয়। পলাশীর ন্যায় গিরিয়াও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় স্থান। উভয়ই মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী। এই দুইটি প্রান্তর ব্যতীত মুর্শিদাবাদের আর কোনও স্থল প্রকৃত সমরক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। পলাশীতে ইংরেজ-রাজত্বের সূচনা হয় এবং গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজ্য-বিস্তারের পথ একরূপ নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। উধুয়ানালায় (উদয়নালা) মীরকাসিমের সৈন্য সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইয়া গেলেও, তথায় প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। মীরকাসিমের সৈন্যদলের সহিত ইংরেজদিগের শেষ যুদ্ধ গিরিয়াতেই হইয়াছিল। পলাশীর ন্যায় গিরিয়াও বাঙ্গলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ নবাব সরফরাজ খাঁ ও আলীবর্দ্দী খাঁর মধ্যে সংঘটিত হয়। নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলীবর্দ্দীকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার একেশ্বর করিবার জন্য সরফরাজের মন্ত্রী হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রায়-রায়ান আলমচাঁদ প্রভৃতি যে ষড়্‌যন্ত্রের সূচনা করেন, গিরিয়া-যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খাঁর মৃত্যু এবং আলীবর্দ্দী খাঁর সিংহাসনারোহণে তাহার চরম পরিণতি। আলীবর্দ্দী খাঁ পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদ-অভিমুখে ধাবিত হইয়া পিপিরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ

মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া গিরিয়ায় শিবির-সন্নিবেশ করেন; কিন্তু তাঁহার কতক সৈন্য খামরায় অবস্থিতি করিতে থাকে। নবাব গিরিয়ায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ ভাগীরথী পার হইয়া প্রায় সূতী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল; কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হওয়ায়, যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আলীবর্দ্দী নিজ সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং নন্দলাল নামে একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অধীনে এক ভাগ রাখিয়া, নিজে অপর দুই ভাগ লইয়া রাত্রিযোগে নদী পার হইলেন। গওস খাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নন্দলালের প্রতি আদেশ ছিল এবং আলীবর্দ্দী নিজে সরফরাজের শিবির আক্রমণ করিবার ভার লন।

প্রভাত হইবামাত্র আলীবর্দ্দী নিজের অধীন দুই দল সৈন্য লইয়া সরফরাজকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ দিয়া আক্রমণ করিলেন। এদিকে নন্দলালও গওস খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সরফরাজ হস্তি-পৃষ্ঠে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। নবাবের হস্তি-চালক তাঁহাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। সরফরাজ তাহাকে তিরস্কার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটি বন্দুকের গুলি সরফরাজের মস্তকে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি হস্তি-পৃষ্ঠেই প্রাণত্যাগ করিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে কেবল সরফরাজই সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। হস্তি-চালক তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, তাহা নেক্টাখালির প্রাসাদে সমাহিত করা হয়।

গওস খাঁ নন্দলালের সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন; নন্দলালও যুদ্ধে হত হন। অতঃপর গওস খাঁ প্রভুর সাহায্যের জন্য গিরিয়া-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কতক দূর অগ্রসর হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রভু বন্দুকের গুলির আঘাতে হস্তি-পৃষ্ঠে চির-শায়িত হইয়াছেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পুত্রদ্বয় মোহম্মদ কুতুব ও মোহম্মদ পীরকে আহ্বান করিয়া, যাহাতে আলীবর্দ্দীকে উপযুক্তরূপ বাধা-প্রদান করিতে পারেন তাহার জন্য পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন না করিয়া

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আপনাদিগের সৈন্য সমবেত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সৈন্যদিগের অধিকাংশই সরফরাজের মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া মুর্শিদাবাদ-অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে লইয়া গওস খাঁ হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক আলীবর্দ্দীর সৈন্য-সাগর মথিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বীর পুত্রদ্বয়ও পিতার অনুগমন করিলেন। তাঁহাদের তরবারি-চালনে আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। আলীবর্দ্দীর গোলন্দাজ-সেনাপতি ছেদন হাজারীর বন্দুকের একটি গুলিতে আহত হইয়া, গওস খাঁ যেমন হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, অমনি আরও দুইটি গুলি আসিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। কুতুব ও পীরের তরবারি-চালনে ছেদন হাজারী সাজ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন ; কিন্তু ছেদন হাজারীর বন্দুকের গুলির আঘাতে পিতৃভক্ত বীর দুইটিরও অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইল। যে স্থানে তাঁহাদের দেহ নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে সমাহিত করা হয়। পরে গওস খাঁর গুরু শাহ্-হায়দরী নামে জনৈক ফকীর তাঁহাদিগের মৃতদেহ গিরিয়া-প্রান্তর হইতে ভাগলপুরে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহাদিগকে পুনঃ-সমাহিত করেন। একদিকে আলীবর্দ্দী খাঁ যেমন বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক প্রভু-পুত্রের রক্তপাত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন, অন্যদিকে সেইরূপ গওস খাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া প্রভুর সিংহাসন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গওস খাঁর কীর্ত্তিকথা বহু দিন যাবৎ গিরিয়ার চতুষ্পার্শ্বে গ্রাম্য-কবিতায় গীত হইয়া আসিতেছে।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গওস খাঁর সহিত সরফরাজের অন্যান্য অনেক সেনাপতি যুদ্ধস্থলে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বীর-বালক জালিমসিংহের করুণ কাহিনী এখানে বিবৃত হইল।

বিজয়সিংহ নামে একজন রাজপুত-বীরের উপর নবাব সরফরাজের সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষার ভার ছিল। বিজয়সিংহ গিরিয়ার নিকট খামরা-নামক স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, তাঁহার প্রভুর অধিকাংশ সৈন্যাধ্যক্ষ একে একে গিরিয়ার ভীষণ

সমরে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, এবং প্রভুও নিজে হস্তি-পৃষ্ঠে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অতি অল্পসংখ্যক অশ্বারোহীর সহিত আলীবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রভুর মৃত্যুতে রাজপুতের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া এক শাণিত বল্লম গ্রহণ করিয়া আলীবর্দ্দীকে লক্ষ্য করিলেন। উজ্জ্বল-তপন-প্রভায় বল্লম প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আলীবর্দ্দী প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ দাওর কুলীর নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া রাজপুত-বীর বিজয়সিংহ গিরিয়া-প্রান্তরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

বিজয়সিংহের নবম-বর্ষীয় পুত্র জালিমসিংহ ছায়ার ন্যায় পিতার অনুবর্ত্তন করিত; কি শিবিরে, কি সমরক্ষেত্রে, কোন স্থানেই ইহার অন্যথা হইত না। যখন বিজয়সিংহ খামরা হইতে গিরিয়া-সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন শিশু জালিমও পিতার সঙ্গে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল। বিজয়সিংহ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলে, বালক নিষ্কোষিত-তরবারি-হস্তে পিতার মৃতদেহ-রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইল। চতুর্দ্দিকে আলীবর্দ্দীর সেনাগণ জয়নিনাদ করিতেছে—রণবাদ্যের গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে—নবম-বর্ষীয় বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপনার ক্ষুদ্র তরবারি লইয়া আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। কি যেন এক মহীয়সী শক্তি তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছিল; তৎপ্রভাবে বালক পিতার মৃতদেহ-রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ক্রমশঃ অসংখ্য সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বালককে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল; জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তাহারা যেন বালককে পেষণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। বালক তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া, স্বীয় ক্ষুদ্র তরবারি চালনা করিতে লাগিল। তরবারি তপনালোকে ঝলসিত হইয়া যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ যতই অগ্রসর হইতেছিল, বালকের উৎসাহ ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আলীবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বালকের অসীম সাহস ও অদ্ভুত পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন, এবং স্বীয় হিন্দু সৈনিকগণকে বিজয়সিংহের মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করিতে আদেশ দিলেন। তখন বালক তাহাদিগকে পিতার দেহ-স্পর্শে অনুমতি দিল।

আলীবর্দ্দীর কতিপয় গোলন্দাজ-সৈন্য বালকের অসামান্য বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। বালক ভাগীরথী-তীরে যথারীতি পিতার সৎকার করিয়া, ভস্মারাশি গঙ্গার পবিত্র সলিলে বিসর্জন দিল। নবম-বর্ষীয় বালকের এইরূপ সাহস ও পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল।

গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। রাজপুত-বালক জালিমসিংহের অদ্ভুত কাহিনী সেই ঘটনাকে অধিকতর স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঘটনাস্থলটি এখনও 'জালিমসিংহের মাঠ' নামে পরিচিত।

পলাশী

পলাশী—এই নাম করিতে ইংলণ্ডীয় নরনারীগণের কণ্ঠ মহানন্দে অবরুদ্ধ হইয়া আসে। এই নাম ক্লাইবের উপাধির সহিত চির-বিজড়িত হইয়া আছে। ইংরেজের গৌরব-ভিত্তি ফোর্ট উইলিয়মের একটি তোরণ-দ্বার এই 'পলাশী'-নাম মস্তকে বহন করিতেছে। এই নামের সহিত কত স্মৃতি, কত কথা, কত বেদনা বিজড়িত রহিয়াছে।

পলাশী-প্রান্তর মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কুলু-কুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে, দক্ষিণে পলাশী-গ্রাম; সেই জন্য এই ইতিহাস-বিখ্যাত প্রান্তরের নাম পলাশী-প্রান্তর। পলাশী-নামে একটি বিশাল পরগনা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। পলাশী-গ্রাম ও পলাশী-প্রান্তর প্রভৃতি সমুদয়ই উক্ত পরগনার অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদাবাদ হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ বাদশাহী সড়ক ভাগীরথীর পূর্ব্ব-তীর দিয়া গমন করিয়াছে, সেই বিস্তৃত সড়ক পলাশী-প্রান্তর ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর গতি-প্রভাবে পূর্ব্বতন সড়ক হইতে বর্ত্তমান সড়কের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এইরূপ শুনা যায়, পূর্ব্বে এই সকল স্থানে অনেক পলাশ বৃক্ষের শ্রেণী থাকায়, ইহাকে পলাশী বলিত; কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয়

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পলাশীর আম্রকুঞ্জের নাম কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পলাশীতে লক্ষ বৃক্ষের উদ্যান ছিল বলিয়া, পলাশী-প্রান্তরের কোন কোন স্থানকে অদ্যাপি লাখবাগ বলিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আম্রকুঞ্জ সেই লাখবাগেরই অন্তর্গত ছিল। পলাশী-প্রান্তর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দুই ক্রোশ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ হইবে।

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে পলাশীর ন্যায় বিস্তৃত প্রান্তর আর নাই। এইখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার চিরস্মরণীয় সমর সংঘটিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন বৃহস্পতিবার এই যুদ্ধ হয়। ইংরেজ বণিক্‌গণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; কিন্তু দেশীয় রাজগণের অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বাঙ্গলার দূরদর্শী সুচতুর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া, মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজুদ্দৌলাকে ইংরেজদিগের দমনার্থ উপদেশ দিয়া যান। সিরাজের মাতৃষ্বসা ও জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী ঘসেটী বেগম চিরদিনই সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন; তিনি গোপনে ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়া সিরাজের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘসেটীর দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ (মতান্তরে, কৃষ্ণদাস) ঢাকার হিসাব-নিকাশ অসম্পূর্ণ রাখিয়া সপরিবারে কলিকাতায় ইংরেজদিগের আশ্রয় লইলে, সিরাজ তাঁহাদিগকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য কলিকাতার গবর্নর ড্রেক্-এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ইংরেজেরা নবাবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগের কাসিমবাজার-কুঠী ও কলিকাতা অধিকার করেন।

কলিকাতার ইংরেজদিগের দুরবস্থার সংবাদ-শ্রবণে মান্দ্রাজ হইতে আড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন ও কর্নেল ক্লাইব ইংরেজদিগের রক্ষার জন্য বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া হুগলী হস্তগত করিলে, নবাব তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবার জন্য পুনর্ব্বার কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সিরাজ তাঁহার সেনাপতির স্বেচ্ছাকৃত শৈথিল্যে ও ক্লাইবের অতর্কিত আক্রমণে নিশা-যদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। নবাব ইংরেজদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না বলিয়া সন্ধিপত্রে স্বীকার করেন এবং তাহাদিগের ক্ষতিপূরণে প্রতিশ্রুত হন। ইংরেজেরাও অন্যান্য

বণিকের ন্যায় ব্যবসায় চালাইবেন এবং নবাবের রাজ্যে গোলযোগ বা শান্তিভঙ্গ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

সন্ধির শর্ত্ত রক্ষা করিতে সিরাজ যথেষ্ট যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইবের অভিসন্ধি অন্যরূপ ছিল; ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, তিনি ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকার করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। রাজ্য-মধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইলে দেশের শান্তিভঙ্গ হইবে, এই আশঙ্কায় নবাব ইংরেজদিগকে চন্দননগর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু ইংরেজেরা নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে বশীভূত করিয়া, চন্দননগর অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নন্দকুমারকে আদেশ দিয়া, রাজা দুর্লভরামকে সসৈন্যে হুগলীতে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দকুমার স্বয়ং ফরাসীদিগের সাহায্য করিলেন না, অধিকন্তু রাজা দুর্লভরামকেও ফিরিয়া যাইতে প্ররোচিত করিলেন। ইহার ফলে ইংরেজেরা সহজেই চন্দননগর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ফরাসীরা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অসামান্য বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নবাব দুর্লভরামকে সসৈন্যে পলাশীতে অবস্থান করিতে আদেশ দিলে, দুর্লভরাম আপনার সৈন্য লইয়া পলাশী-প্রান্তরে আসিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে সিরাজের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল—জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি তাহার অধিনায়ক। য়ার লতীফ খাঁ নামে নবাবের একজন সেনাপতি নবাবী-প্রাপ্তির আশায় ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন; মীরজাফরও সেই মর্ম্মে আবেদন করেন। ইংরেজেরা মীরজাফরকে নবাবী দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু য়ার লতীফকেও আশ্বাস দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজেরা নবাবকে পলাশী-প্রান্তর হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলে নবাব প্রথমে স্বীকৃত হন, কিন্তু অবশেষে ইংরেজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ক্লাইবও চতুরতা-পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। যখন উভয় পক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন উভয় পক্ষই পলাশী-প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইংরেজ-সৈন্য পলাশীর দিকে যাত্রা করিয়া ২২এ জুন রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হয় এবং পলাশীর আম্রকুঞ্জ-মধ্যে আশ্রয় লয়। মীরজাফর প্রভৃতির অভিসন্ধি নবাব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্কট-সময়ে মী[illegible] সহিত বিবাদ মিটাইয়া, প্রথমে তাঁহাকেই পলাশী-অভিমুখে যাইবার আদেশ দেন। বলা বাহুল্য, মীরজাফর তখনও মৌখিক সদ্ভাব প্রদর্শন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মীরজাফর পলাশী-অভিমুখে যাত্রা করিবার পর, ইংরেজদিগের পৌঁছিবার প্রায় ১২ ঘণ্টা পূর্ব্বে নবাব পলাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবাব পলাশীতে পৌঁছিলে, তাঁহার সমস্ত সৈন্য এক পরিখা-বেষ্টিত স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিল। পরিখার সম্মুখে একটি বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে কামান-শ্রেণী সংস্থাপন করা হইল। পরিখার বাহিরে, বুরুজ হইতে প্রায় ৬ শত হস্ত পূর্ব্বে, একটি বনাচ্ছন্ন পাহাড়ী বা উচ্চভূমি ছিল। পাহাড়ী ও বুরুজ হইতে ১৬ শত হস্ত দক্ষিণে একটি ছোট পুষ্করিণী এবং তাহা হইতে আরও ২ শত হস্ত দক্ষিণে আম্রকাননের নিকটে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুষ্করিণী আপনাদিগের অনতি-উচ্চ পাহাড়ী-বেষ্টিত হইয়া প্রান্তর-বক্ষে বিরাজিত ছিল।

২৩এ জুন প্রাতঃকালে নবাব-সৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া কুঞ্জ-অভিমুখে যাত্রা করিল এবং সমস্ত প্রান্তর বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সিন্‌ফ্রে বা সেন্ট ফ্রায়াস নামে একজন ফরাসী গোলন্দাজ-সেনাপতির নায়কত্বে কতিপয় ফরাসী-সৈন্যের সহিত নবাব-সৈন্যের কিয়দংশ আম্রকুঞ্জের সন্নিহিত বৃহত্তর পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মীরমদন এবং মীরমদনের পশ্চাতে মোহনলাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে, আম্রকানন অতিক্রম-পূর্ব্বক প্রায় পলাশী-গ্রাম পর্য্যন্ত, নবাব-সৈন্য দুর্লভরাম, য়ার লতীফ ও মীরজাফরের অধীনে সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল—এই তিন জনই বিশ্বাসঘাতক ও ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের নেতা, ইঁহাদেরই নেতৃত্বে নবাবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য ছিল। যুদ্ধকালে ইঁহারা সামান্য-মাত্র পদবিক্ষেপও করেন নাই। ক্লাইব আম্রকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী শিকার-মঞ্চ হইতে শত্রুপক্ষের সৈন্য-সাগর নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহাদিগকে

অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে আদেশ দিলেন, এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সম্মুখে একটি সামান্য বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে কামান-শ্রেণী সংস্থাপন করা হইল।

বেলা আট ঘটিকার সময়ে প্রথমে সিন্‌ফ্রের অধীন সৈন্যগণ গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। ইংরেজেরাও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তিন ঘণ্টা এইভাবে যুদ্ধ চলিল। ক্লাইব কোনরূপ সুবিধা বুঝিতে না পারিয়া, সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ হটিয়া আম্রকুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন এবং অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া, রাত্রিযোগে নবাবকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায়, নবাবের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ইংরেজেরা আপনাদিগের বারুদ আবরণ-দ্বারা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বারুদ ভিজিয়া যাওয়ায়, নবাবকে বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ইংরেজ-সৈন্য আম্রকাননে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, নবাবের সেনাপতি মীরমদন এক দল অশ্বারোহী-সৈন্য-সহ সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে না যাইতেই ইংরেজদিগের একটি গোলা আসিয়া তাঁহাকে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত করিল; ইহাতে নবাব-সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মীরমদনের পশ্চাদ্ভাগে হিন্দু-বীর মোহনলাল অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, ইংরেজদিগকে মথিত করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইলেন। তাঁহার আক্রমণে ইংরেজ-সৈন্যগণ অস্থির হইয়া ক্রমশঃ কুঞ্জ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক মহা-অনর্থের সূত্রপাত হইল।

মীরমদনের পতন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সিরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মীরজাফরকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া, সেই আসন্ন বিপদ্ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মীরজাফর সে দিবস নবাবকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উত্তর দিলেন যে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলে আর কিছুতেই জয়ের আশা থাকিবে না। সিরাজ মীরজাফরকে মোহনলালের কথা জানাইলে, মীরজাফর উত্তর

দিলেন যে, তিনি নবাবকে সময়োচিত সৎপরামর্শই দিয়াছেন; এক্ষণে নবাবের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রায়দুর্লভও তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে যাইতে পরামর্শ দিলেন। মীরজাফরের এইরূপ উত্তর শুনিয়া সিরাজ আরও ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং পুনর্ব্বার মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। বারংবার এবংবিধ আদেশে বিরক্ত হইয়া মোহনলাল যেমন প্রতিনিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি নবাব-সৈন্য চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজ-সৈন্য আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া নবাব-সৈন্যের উপর মহাবেগে আপতিত হইল।

এস্থলে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ক্লাইবের সম্বন্ধে এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ক্লাইব স্বীয় সৈন্যদিগকে আম্রকুঞ্জ-মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া, স্বয়ং শিকার-মঞ্চে বিশ্রাম করিতেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের পরামর্শের ফলে মোহনলাল রণস্থল ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, নবাব-সৈন্যগণ যখন প্রতিনিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই সময়ে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ইংরেজ-সৈন্যদিগকে আদেশ দিয়া, একজন সৈনিক-কর্ম্মচারী-দ্বারা ক্লাইবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; সৈনিক-কর্ম্মচারী গিয়া দেখিলেন, ক্লাইব নিদ্রা যাইতেছেন। অতঃপর সংবাদ-শ্রবণে ক্লাইব প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং কিল্‌প্যাট্রিককেও তিরস্কার করিলেন; কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কিল্‌প্যাট্রিকের কার্য্য যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তখন তিনি নিজেও নবাব-সৈন্যের অভিমুখে মহাবেগে ধাবিত হইলেন।

এদিকে নবাব-সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি-ত্রয় ইংরেজদিগকে কোনপ্রকার বাধা প্রদান করিল না। কিন্তু সেনাপতি সিন্‌ফ্রে ইহাতে বিচলিত না হইয়া, আপনার অধীন অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়াই ইংরেজদিগের গতিরোধ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ হটিয়া নবাবের বুরুজ, পরিখাভ্যন্তর এবং পাহাড়ী হইতে ক্রমান্বয়ে গোলাগুলি চালাইতে লাগিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, পলাশী-যুদ্ধের মধ্যে এইটুকুই প্রকৃত যুদ্ধ। সিন্‌ফ্রে শত চেষ্টা করিয়াও ইংরেজদিগের গতি-রোধ ও নবাবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে ইংরেজেরা নবাবের পরিখা-বেষ্টিত শিবির অধিকার করিলেন। কিন্তু

সিরাজ ইতিপূর্ব্বেই উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধের অবসান হইল। ২৯এ জুন ক্লাইব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরকে মস্‌নদে উপবেশন করাইলেন।

এই যুদ্ধে নবাবের ৩৫ হাজার পদাতি, ১৫ হাজার অশ্বারোহী, ও ৫৩টি কামান ছিল; তাহাদের মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি-ত্রয়ের অধীনে নিযুক্ত ছিল। ইংরেজদিগের ৯ শত ইউরোপীয়, ১ শত তোপাসী ও ২১ শত সিপাহী মাত্র ছিল। ইংরেজদিগের নাকি ৭০ জন মাত্র হত ও আহত হয়। ইহা হইতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই—ইংরেজেরা একরূপ বিনা-যুদ্ধেই পলাশীতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জয়লাভ তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে অজেয় করিয়া তুলিয়াছে। কেবল বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়্‌যন্ত্র এবং সিরাজুদ্দৌলার অব্যবস্থিতচিত্ততা ও কাপুরুষতাই এই বিজয়ের কারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশী-প্রান্তরের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, অদ্যাপি তাহা নিজ বিশাল কায় বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। প্রান্তর প্রায় তৃণহীন; কোন কোন স্থানে দুই-চারিটি বৃক্ষ পলাশীর উত্তপ্ত বক্ষঃস্থলে ছায়া প্রদান করিতেছে। মীরমদনের বীরত্ব-কাহিনী ও পলাশী-যুদ্ধের কথা পলাশী-অঞ্চলে অদ্যাপি গ্রাম্য-কবিতায় গীত হইয়া থাকে।

উধুয়ানালা

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে মহা-বিপ্লবাগ্নি বঙ্গদেশে প্রধূমিত হইতে হইতে পলাশী-সমরক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা অবশেষে উধুয়ানালায় মুসল্‌মান-গৌরবকে চির-ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। উধুয়ানালা বাঙ্গলার মুসল্‌মান-গৌরবের শ্মশানভূমি। এইখানে বাঙ্গলার নবাব মীরকাসিম আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিয়া বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনস্তাপে ফকীরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

উধুয়ানালা রাজমহল হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পর্ব্বে অবস্থিত। উধুয়ার উপত্যকা সৈন্যগণের অবস্থানের উপযোগী একটি সুন্দর স্থান। ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ হইলে, মীরকাসিম উধুয়ার পার্ব্বত্য-পথ অধিকার করিয়া সেই সুদৃঢ় স্থানে সৈন্য-সমাবেশ-পূর্ব্বক, ইংরেজদিগের বিহার-প্রবেশে বাধা-প্রদানে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

মীরকাসিম ইংরেজদিগের সাহায্যেই বাঙ্গলার সুবেদারী লাভ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, তিনি বিহার-অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই সময়ে বাদশাহ্ দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলী গওহর (পরে ‘ বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম ’ নামে খ্যাত) বিহার আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিলেন। অতঃপর ইংরেজ ও মীরকাসিমের সহিত শাহ্ আলমের সন্ধি স্থাপিত হইলে, মীরকাসিম ইংরেজদিগের দৃষ্টি ও প্রভাব যথাসাধ্য এড়াইবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া বিহারে অবস্থান করিতে মনস্থ করেন, এবং সেইজন্য মুঙ্গের-দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই সময়ে বাণিজ্য-ঘটিত শুল্ক-ব্যাপার লইয়া ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসিমের বিবাদ বাধিয়া উঠে। প্রথমে ইংরেজদিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল। এক দল মীরকাসিমের পক্ষপাতী ; এই দলের মধ্যে গবর্নর ভান্সিটার্ট, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি প্রধান। অন্য দল নবাবের ঘোরতর বিপক্ষ ; এলিস, আমিয়ট প্রভৃতি কাউন্সিলের সভা সেই দলের নেতা। এলিস পাটনা-কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া নবাবকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করায়, নবাব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এই ক্রোধের ফলে অবশেষে আমিয়ট ও এলিস দুই জনকেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে মীরকাসিমও ইংরেজদিগের কোপানলে পড়িয়া বঙ্গরাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

ইংরেজেরা আপনাদিগের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলিকাতা-কাউন্সিল হইতে এইরূপ এক নিয়ম জারী করেন যে, কাউন্সিলের অনুমতিপত্র লইয়া, যে-কোন ইংরেজ বিনা-শুল্কে সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী করিতে পারিবে ; কিন্তু অন্যান্য লোকে বাণিজ্য-দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী করিতে গেলে, তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হওয়ায়, যে সমস্ত নৌকায় ব্রিটিশ নিশান ও ইংরেজ-সিপাহীর

ন্যায় পরিচ্ছদ-ধারী আরোহিগণ থাকিত, সেগুলিও নবাবের কর্ম্মচারীদিগের অনুসন্ধান হইতে নিষ্কৃতি পাইত। এই কারণে কেবল কোম্পানী নহে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা গুপ্ত-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাঁহারাও প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এইরূপ অসঙ্গত-বাণিজ্যের ফলে ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত ব্যবসায় তাঁহাদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ অর্থহীন হওয়ায়, দেশীয় ব্যবসায়িগণের ধ্বংসমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইল; নবাবের রাজস্বেরও বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। সাধারণ বণিক্‌গণ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-নিশান উড়াইয়া ও ইংরেজ-সিপাহীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, অবাধে বাণিজ্য চালাইতে লাগিল। যে যে স্থানে নবাবের কর্ম্মচারিগণ অনুমতিপত্রের অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে নিকটবর্ত্তী ইংরেজ-কুঠীর অধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে রাজস্বের ক্ষতি হওয়ায়, মীরকাসিম কলিকাতা-কাউন্সিলে বারংবার পত্র লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু কলিকাতা-কাউন্সিল তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। গবর্নর ভান্সিটার্ট কাউন্সিলের সভ্যদিগকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুরোধও গ্রাহ্য হয় নাই। অবশেষে কাউন্সিলের সভাগণের পরামর্শ-অনুসারে ভান্সিটার্ট সমস্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য মুঙ্গের যাত্রা করেন। তথায় নবাবের সহিত তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসেন যে, যেখানে ইংরেজেরা শতকরা ৯ টাকা মাশুল দিবেন, সেখানে দেশীয়দিগকে শতকরা ২৫ টাকা মাশুল দিতে হইবে, এবং ইংরেজদিগের অনুমতিপত্র ইংরেজ অধ্যক্ষগণের স্বাক্ষরিত হইয়া, নবাবের রাজস্ব-কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পুনঃ-স্বাক্ষরিত হইবে। ভান্সিটার্ট মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় আসিয়া কাউন্সিলে এই সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন; কিন্তু সভ্যগণ তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা মাত্র লবণের জন্য শতকরা ২॥· টাকা মাশুল দিতে চাহিলেন, এবং যেখানে তাঁহাদের লোকের সহিত নবাবের লোকের গোলযোগ হইবে, ইংরেজ অধ্যক্ষেরাই তাহার বিচার করিবেন, এই অধিকার দাবী করিলেন।

কাউন্সিলের এইরূপ মত শুনিয়া মীরকাসিম অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, সকল বণিক্‌কেই

রাজ্য-মধ্যে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইংরেজদিগকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। কাউন্সিলের সভ্যেরা পুনর্ব্বার আমিয়ট ও হে-কে নবাবের নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইল না। ক্রমে বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, উভয় পক্ষই যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে নবাবের কোন কোন কর্ম্মচারী বন্দী-অবস্থায় কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমিয়ট ও হে নবাবের নিকট হইতে বিদায় চাহিলে, নবাব ঐ সকল কর্ম্মচারীর মুক্তি-পর্য্যন্ত হে-কে মুঙ্গেরে থাকিতে বলেন; সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মুঙ্গেরে থাকিতে হইল। আমিয়ট নৌকাযোগে মুঙ্গের হইতে কলিকাতা রওনা হইলেন। ইংরেজদিগের সহিত আপনার বিবাদের সংবাদ নবাব রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় আগমন-কালে আমিয়ট মুর্শিদাবাদে নবাবের লোক-দ্বারা নিহত হইলেন। এদিকে এলিস সহসা পাটনা অধিকার করিয়া বসিলেন; কিন্তু মীরকাসিমের সৈন্যগণ তাহা পুনরধিকার করিল। উভয় পক্ষের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিল। মেজর আডাম্‌স্‌-এর অধীন ইংরেজ-সৈন্য রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মীরকাসিম স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় রণকৌশলে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে কারখানা স্থাপন করিয়া কামান, বন্দুক, গোলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। মুঙ্গেরে নির্ম্মিত বন্দুক ইউরোপীয় বন্দুক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন। সমরু নামে এক জন ইউরোপীয় এবং গর্গিন খাঁ ও মার্কার প্রভৃতি কয়েক জন আর্ম্মেনীয় তাঁহার সৈন্যদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে ব্যাপৃত হন। গর্গিন খাঁ প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গর্গিন খাঁ খাজা পিক্রস্‌ নামে কলিকাতার একজন আর্ম্মেনীয় সওদাগরের ভ্রাতা। পিক্রস্‌-এর মধ্যবর্ত্তিতায় গর্গিন খাঁর সহিত ইংরেজদিগের গোপন-পরামর্শ চলিত, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায়, অবশেষে নবাবের আদেশে গর্গিন খাঁ নিহত হন।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই কাটোয়ার পর-পারে পলাশীর নিকটে মোহম্মদ তকী খাঁর সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে মোহম্মদ তকী খাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। ২৩এ মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলের

নিকটে নবাব-সৈন্য পরাজিত হইয়া সূতীতে পলায়ন করে। ২৫এ ইংরেজেরা মীরজাফরকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে উপবেশন করান। ১লা আগষ্ট গিরিয়া সমরক্ষেত্রে ইংরেজ ও নবাব-সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; তাহাতে নবাব-সৈন্য পরাজিত হইয়া, উধুয়ানালায় পলায়ন করে। উধুয়ানালায় পূর্ব্ব হইতেই নবাবের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল; পরাজিত সৈন্যগণ সেই শিবিরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

গিরিয়ার পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মীরকাসিম আরাতুন নামে একজন আর্ম্মেনীয়ের অধীনে ইউরোপীয় রণকৌশলে শিক্ষিত ৪ হাজার সৈন্য এবং দেশীয় সেনাপতি মীর নজফ খাঁ, মীর হিম্মৎ আলী, মীর মেহ্‌দী খাঁ প্রভৃতির অধীনে ১২ হাজার অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজ সৈন্য উধুয়ানালায় পাঠাইয়া দিলেন। গিরিয়া হইতে পরাজিত সম্রু, মার্কার, আসাদুল্লা প্রভৃতির অধীন সৈন্যসমূহ তাহাদের সহিত যোগ দেওয়ায়, মোট সৈন্য-সংখ্যা ৪০ সহস্রেরও অধিক হয়। মেজর আডাম্‌স গিরিয়াতে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া, ৪ঠা আগষ্ট উধুয়ানালা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে ফুদ্‌কিপুর নামক স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করেন। ইংরেজদিগের শিবিরের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে ঝিল ছিল। ইংরেজেরা পরিখা খনন করিয়া তথায় বুরুজ নির্ম্মাণ করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, বুরুজাদির নির্ম্মাণে মেজর আডাম্‌সকে তিন সপ্তাহ কাল ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি নবাব-শিবির লক্ষ্য করিয়া তিনটি বুরুজ হইতে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে নবাব-শিবিরের বিশেষ কোনও ক্ষতি করিতে পারেন নাই; কেবল, নদী-সন্নিহিত প্রবেশ-পথের নিকট পরিখা-প্রাচীর সামান্য ভগ্ন হইয়াছিল।

উধুয়ানালায় ইংরেজদিগের সহিত নবাব-সৈন্যের প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। সহস্র চেষ্টা করিয়াও ইংরেজেরা নবাব-শিবির ভেদ করিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে চাতুরী অবলম্বন-পূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উধুয়ানালার সুরক্ষিত অবস্থান দেখিয়া মীরকাসিমের সেনাপতিগণ নিশ্চিন্তমনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুরাপানে বিভোর হইয়া শিবির মধ্যে রজনী-যাপন করিতেন। কিন্তু মীর নজফ খাঁ নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

তিনি অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, পরিখার যে অংশ পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার নিকটে ঝিলের একটি স্থানের জল নাতি-গভীর, এবং তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া ইংরেজ-শিবিরে যাওয়া যাইতে পারে। নজফ খাঁ কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ঝিলের সেই অল্প-গভীর স্থানটি পার হইয়া, ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করিলেন। তৎপূর্ব্বেই বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর ইংয়েজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নজফ খাঁর আক্রমণে ভীত হইয়া, তিনি গঙ্গা-বক্ষে নিজ নৌকায় পলায়ন করেন। তাঁহার নৌকা নদী-গর্ভে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে, ইংরেজেরা কতকগুলি তেলিঙ্গাকে তাঁহার সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। নজফ খাঁ ইংরেজ-শিবির লুণ্ঠন-পূর্ব্বক বহু দ্রব্যসম্ভার লইয়া আপনাদিগের সুরক্ষিত শিবিরে প্রত্যাগত হন। তিনি আরও দুই এক বার ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করিলে, ইংরেজেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কোন্ পথ দিয়া তিনি উপস্থিত হন, তাহার আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

সহসা একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। এক ইংরেজ-সৈনিক কোন কারণে কোম্পানীর চাকরী হইতে বিতাড়িত হইয়া, মীরকাসিমের সৈন্যদিগের সহিত যোগ দেয়। এক্ষণে সে পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, ইংয়েজদিগকে নবাব-শিবির-আক্রমণের উপায় বলিয়া দিবার জন্য ইংরেজ-শিবিরে উপস্থিত হইল। সে সেই ঝিল পার হওয়ার গোপন-পথ জানিত। ইংরেজেরা তাহার পূর্ব্ব-অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। পরে তাহার পরামর্শ-অনুসারে তাঁহারা নবাব-শিবির আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিশেষে ইংরেজ-সৈন্য উধুয়ানালার শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। কাপ্তেন আর্ভিং-এর অধীনে এক দল সৈন্য ঝিল পার হইয়া এবং কাপ্তেন মোরানের অধীনে আর এক দল সৈন্য পরিখা-অভিমুখে গমন করিয়া বিপক্ষদিগকে কৃত্রিম আক্রমণে প্রতারিত করিবার জন্য যাত্রা করিল। আবশ্যক হইলে, মোরান উক্ত কৃত্রিম আক্রমণকে প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। আর্ভিং ঝিল পার হওয়ার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে সেই অল্প-গভীর স্থানের অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা ঝিল অতিক্রম করে। আর্ভিং-এর

অধীন ইংরেজ-সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে প্রাচীরের তলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় যে সমস্ত প্রহরী ছিল, তাহাদিগকে তাহারা সঙ্গীন-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল এবং অবিলম্বে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া পড়িল। নবাব-সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজ-সৈন্যগণ পীর-পাহাড় অধিকার করিয়া লইল। সহসা মশাল প্রজ্বালিত হইয়া, অন্ধকারময়ী রজনীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে মোরানের কামানও গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহার সৈন্যগণও পরিখা পার হইয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। যদি মীরকাসিমের সৈন্যেরা সামান্যমাত্রও সতর্কতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে মোরান কদাচ পরিখা পার হইয়া প্রাচীরে উঠিতে পারিতেন না।

মোরানের সৈন্যেরা পীর-পাহাড় হইতে অবতীর্ণ আর্ভিং-এর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া, নবাব-শিবির-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ইংরেজ-কামানের গর্জ্জন উধুয়ার পর্ব্বতশ্রেণীকে বিকম্পিত করিয়া তুলিল। রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, কামান ও বন্দুক হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নবাব-সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইল না; তাহাদের অল্পসংখ্যক সৈন্য উধুয়ানালার পর-পারে সেতুর নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া, ইংরেজ-অধিকৃত আপনাদিগের শিবির লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। যে উধুয়া পার হইবার চেষ্টা করিল, সে অমনি নালার মধ্যে ডুবিয়া গেল। নবাব-সৈন্যগণ যতক্ষণ পারিল ইংরেজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিল। এই আক্রমণে নবাব-পক্ষের প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়; তাহাদের অনেকগুলি কামানও ইংরেজেরা হস্তগত করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে সমস্ত শিবির ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়া যায়। সমরু ও মার্কার্-এর সৈন্যেরা ইংরেজদিগকে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে তাহারা উধুয়ানালা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইংরেজেরা উধুয়ানালা হইতে রাজমহলে উপস্থিত হন, এবং পরে মুঙ্গের-অভিমুখে যাত্রা করেন। মীরকাসিম ইতিপূর্ব্বেই মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুঙ্গের-পরিত্যাগের পূর্ব্বে, জগৎশেঠ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া বধ করা হয়। মীরকাসিম

পলায়ন করিয়া, প্রথমে অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। শুজাউদ্দৌলা পরে মীরকাসিমের উপর অসন্তুষ্ট হওয়ায়, মীরকাসিম তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং বঙ্গরাজ্য পুনরধিকারের আশা বিসর্জন দিয়া রোহিলখণ্ড-অভিমুখে পলায়ন করেন।

এইরূপে উধুয়ানালায় মীরকাসিমের সমুদয় সৈন্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। পলাশী ও উধুয়ানালা এই দুই স্থানেই বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরী নবাব-পক্ষের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছিল।

উধুয়ানালায় যে স্থানে ইংরেজেরা মীরকাসিমের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইখানে একখানি নূতন গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহারও নাম উধুয়া। এখনও উধুয়ার ভূমি খনন বা কর্ষণ করিলে, তথায় মধ্যে মধ্যে গোলাগুলি পাওয়া যায়।